

আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি
চতুর্থ শ্রেণি



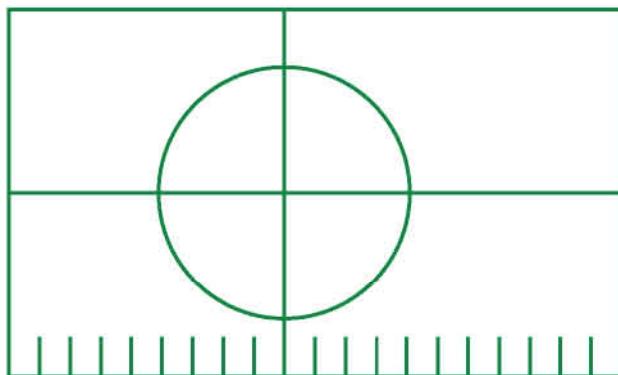
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি
ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত $10 : 6$ । অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য 305 সেমি (10 ফুট) হয়, প্রস্থ 183 সেমি (6 ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের 20 ভাগের 9 ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

305 সেমি \times 183 সেমি ($10' \times 6'$)

152 সেমি \times 91 সেমি ($5' \times 3'$)

76 সেমি \times 46 সেমি ($2\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}'$)

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে স্বাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অস্বানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী ঝেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে স্বাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে স্বাণে পাগল করে,
ও মা, অস্বানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী ঝেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

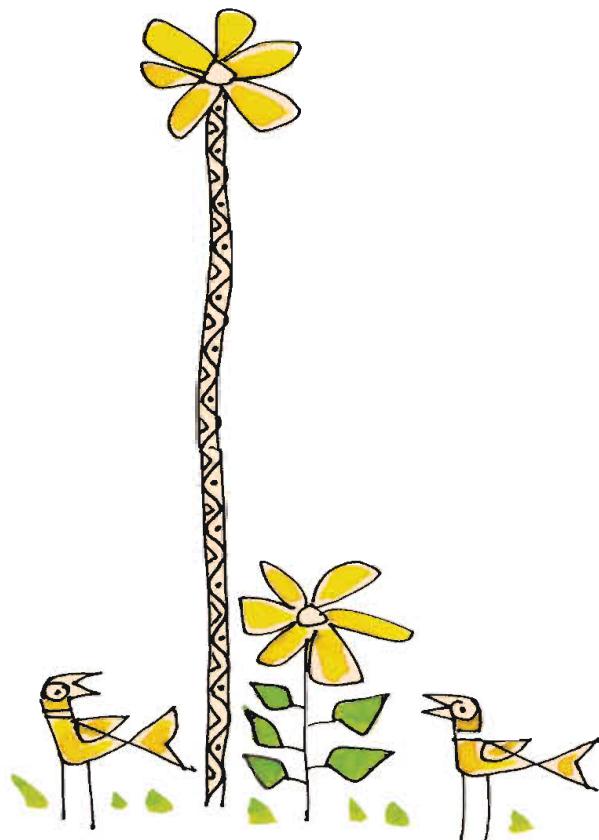
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি
চতুর্থ শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা
হায়াৎ মামুদ
মহামাদ দানীউল হক
মাসুদুজ্জামান

শিল্পসম্পাদনা
হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিষয়। তার সেই বিষয়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অস্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষার্থীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিষয়বোধ, অসীম কৌতুহল, অফ্ফেন্স আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাষা বাংলা। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ্য শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠ্য যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ্য ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিকৰ্মী প্রয়াস। প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তিত একুশটি পাঠ্যপুস্তক ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে গ্রহণ করেছে। শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণে সরকার ইবতেদায়ি স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করছে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বত্ত্ব প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্ছুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সম্প্রিদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

চতুর্থ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা-শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্তুষ্টিপূর্ণভাবে করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনা-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংযুক্ত ভাষা-পরিম্পত্তি বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা-শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা-শিখনের বিশেষ করে পড়ার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষা দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন :

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন :

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শুন্তিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রমিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন যাতে চিন্তার উদ্দেশ্য করে;
- চিন্তা করতে ও পর্যাপ্ত কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত ও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

চতুর্থ শ্রেণি শেষে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো :

- শুন্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া;
- সঠিক উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- সঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোধ্যার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোধ্যার করা;
- পড়া সংশ্লিষ্ট শিখন অনুশীলনী সম্পন্ন করা;
- যুক্তব্যজ্ঞন সম্পর্ক ও শুধু উচ্চারণে পড়া।

শেখা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় লিখতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখার কাজ এককভাবে করাতে পারেন। শিক্ষক জুটিতে এমনকি দলেও শিক্ষার্থীদের লেখার কাজ করাতে পারেন। শিক্ষার্থীরা আলোচনা করবে এবং নিজের মতামত নিজের ভাষায় লিখবে। এতে তাদের লেখার দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা সহজ বাকে নিজেদের পছন্দমতো শব্দ দিয়ে লেখার কাজ শুরু করতে পারে।

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্রক্ষে নির্দেশনা

ভাষা শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তককে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রতিটি পাঠের শেষে ভাষা-শিখনের জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ড রয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ শেষে শিখন-সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রতিটি পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় থাকবে। পর্যায় তিনটি হচ্ছে :

পর্যায় ১ : নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহ, বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক ভাষা শিখন-শেখানোর জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। এটি মূলত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠের অর্থ বুঝতে সহায়তা করবেন।

পর্যায় ২: ভাষা-শিখন সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা শিখনের জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণের পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষাদক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-সংশ্লিষ্ট শিখন কর্মকাণ্ডে সম্মুক্ত হবে। শিক্ষক এ পর্যায়ে ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করবেন।

পর্যায় ৩: অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ থেকে অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষক জীবন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত শিখন ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবেন। অর্জিত শিখন যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে তা এই পর্যায়ের শিখন-শেখানোর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উন্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুনু করা;
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শুন্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক ভাষা শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন-কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে :

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিরামচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার;
- কথোপকথনভিত্তিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন-নদী, ঝর্ণা, প্রিয় প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সমমানের গল্প, কবিতা পড়া।

উল্লিখিত শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চৰ্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে এ পর্যায়ে শিখন কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বর্ণ ভেঙে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষক দেয়ালে অর্থসহ নতুন শব্দ এবং বিশ্লেষণসহ যুক্তবর্ণের তালিকা টানিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের দেয়াল-তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় যুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখবে। পাঠের উভয় লেখার সাথে এ ধরনের লেখার পার্থক্য হলো, এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর। লেখায় নিজের জানা শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীকে পাঠে পড়ানো হয়নি এমন শব্দগুলি যদি শিক্ষার্থী এ ধরনের লেখায় ব্যবহার করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশংসন করবেন। লেখায় বানান ভুল করলে সংশোধনের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেবেন। বানান শুন্ধ হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রশংসন করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

ভাষা-শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন-উদ্দেশ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে জন্য শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন। ভাষাদক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করবেন। ভাষা শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডগুলি যাতে যৌক্তিক হয়, শিক্ষককে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিখনে যাতে সহায়ক হয় শিক্ষক, সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাঝে সংগঠিত সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ভাষা-শিখনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই ভাষা-শিখন-শেখানোর সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অবাধ সুযোগ থাকবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর জীবন ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা-শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।



সূচিপত্র

বিষয়

	পৃষ্ঠা
১. বাংলাদেশের প্রকৃতি	১
২. পালকির গান	৬
৩. বড় রাজা ছোট রাজা	৯
৪. বাংলার খোকা	১৪
৫. মুক্তির ছড়া	১৯
৬. আজকে আমার ছুটি চাই	২২
৭. বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা	২৬
৮. মহীয়সী ঝোকেয়া	৩২
৯. নেমন্তন্ত্র	৩৭
১০. মোবাইল ফোন	৪০
১১. আবোল-তাবোল	৪৫
১২. হাত ধূয়ে নাও	৪৮
১৩. মোদের বাংলা ভাষা	৫৩
১৪. বাওয়ালিদের গল্প	৫৬
১৫. পাখির জগৎ	৬১
১৬. কাজলা দিদি	৬৭
১৭. পাঠান মুলুকে	৭১
১৮. মা	৭৫
১৯. ঘুরে আসি সোনারগাঁও	৭৮
২০. বীরপুরুষ	৮৪
২১. পাহাড়পুর	৮৮
২২. লিপির গল্প	৯২
২৩. খলিফা হ্যরত উমর (রা)	৯৭

● শব্দের অর্থ জেনে নিই



বাংলাদেশের প্রকৃতি

ষড়খন্তুর দেশ বাংলাদেশ। প্রতি দুই মাসে হয় একটি খতু। যেমন বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাস দুটি হলো গ্রীষ্মকাল। এরপর আষাঢ়-শ্রাবণ মিলে বর্ষাকাল। এভাবে ভাদ্র-আশ্বিন হচ্ছে শরৎকাল। তার পরে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস দুটি নিয়ে হেমন্তকাল। পৌষ আর মাঘ মাস হলো শীতকাল। ফাল্গুন ও চৈত্র এ দু মাস বসন্তকাল।

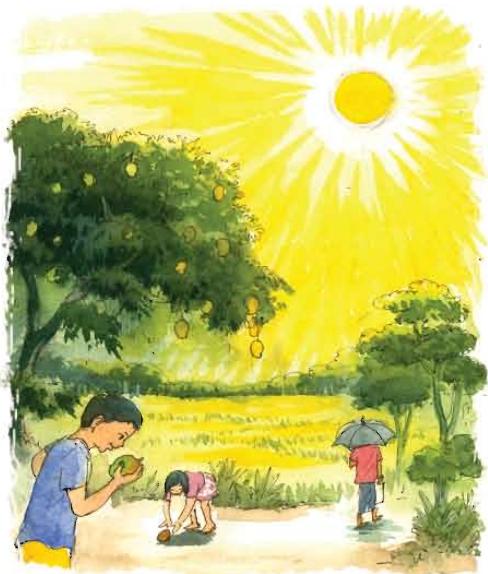
এরকমভাবে ছয়টি খতুই প্রত্যেক বছর আসা যাওয়া করে। পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু দুই মাসে একটি খতু হয় না। অনেক দেশে দুটি কি তিনটি খতু দেখা যায়। খুব বেশি হলে চারটি খতু। আমাদের প্রতিটি খতুতে প্রকৃতির রয়েছে নতুন নতুন সাজ। একেক সাজে তাকে নতুন মনে হয়, তার চেনা চেহারা বদলে যায়।

প্রথমে গ্রীষ্মের কথাই ধরা যাক। গ্রীষ্মে কী প্রচণ্ড গরম! রৌদ্রের অসহ্য তাপ। দুপুরে যদি পথে বের হতেই হয়, তখন মাথার ওপরে ছাতা ধরে লোকে হাঁটে। গরম যতই হোক, গ্রীষ্মকে কিন্তু মধুমাস বলা হয়। এসময় মধুর মতো মিষ্টি নানা ফল পাওয়া যায়। আম, জাম, কাঠাল, আনারস ও লিচু গ্রীষ্মকালের ফল।

গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। বর্ষায় আবার একেবারে অন্য চেহারা। আকাশ তখন কালো ঘন মেঘে ছেয়ে যায়।

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। কখনো বড় বড় ফোঁটায়, তবে ধীরে ধীরে। কখনো ঝুড়মুড় করে। কখনো পড়ছে ঝিরঝির করে, খুব হালকা। এ ধরনের বৃষ্টির একটা নাম আছে। একে বলা হয় ইলশেগুড়ি। আর বড় বড় ফোঁটায় প্রচুর বৃষ্টির নাম মুষলধারে বৃষ্টি। কখনো আবার পড়ে বমবম বৃষ্টি। নদীতে তখন ঢল নামে। বর্ষায় ফোটে কদম, কেয়া ও আরও নানা ফুল।

বর্ষার পর আসে শরৎ। শরৎ এলেই আবার সব পালটে যায়। শরৎকালে আকাশে সাদা মেঘ পেঁজা তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। আকাশ হয়ে ওঠে ঘন নীল। এ সময় ফোটে শিউলি ফুল। নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে যায়।



গ্রীষ্মকাল



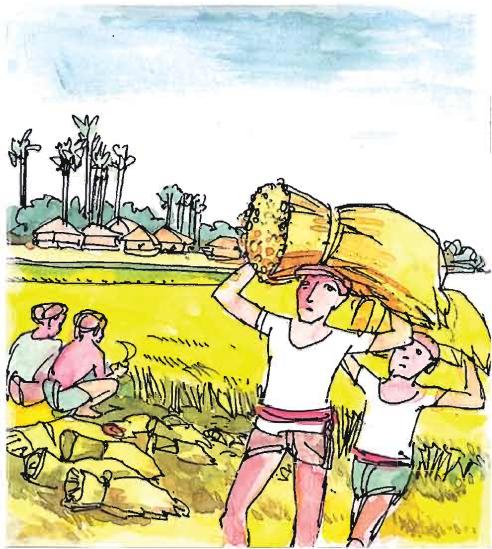
বর্ষাকাল

শরতের পর পাকা ধানের শীষ নিয়ে আসে হেমন্ত। শুরু হয় ধান কাটা। এ সময় কৃষকের ঘর সোনালি ফসলে ভরে ওঠে। নবান্নের উৎসব ঘরে ঘরে আনন্দ নিয়ে আসে।

হেমন্তের শেষ দিকে শীতের আগমন টের পাওয়া যায়। তখন ভোরবেলায় একটু একটু শীত লাগে। এ সময় উত্তুরে হাওয়া বয়। উত্তর দিক থেকে আসা এ হাওয়া খুব ঠাণ্ডা। শীতের রাতে লেপ-কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমোতে হয়। দিনের বেলায়ও গরম কাপড় পরতে হয়। শীতে খেজুরের রস দিয়ে তৈরি হয় নানা পিঠাপুলি। গ্রামে পিঠা-পায়েস তৈরির ধূম পড়ে যায়।



শ্রাবনকাল



হেমন্তকাল



শীতকাল



বসন্তকাল

যেই শেষ হলো এ খাতু, অমনি শুরু হয় বসন্তকাল। ফুরফুরে সূন্দর বাতাস বয়। বসন্তের দখিনা
হাওয়ায় মন ভরে যায়। বসন্তে কোকিল ডাকে। কোকিলের ডাক বড়ই মিষ্টি। গাছে গাছে জেগে
ওঠে নতুন সবুজ পাতা। নানা রঙের ফুলে ভরে যায় গাছ।

বাংলাদেশে এই ছয়টি খাতু এভাবে আসে-যায়। ষড়খাতুর এত বিচ্ছিন্ন, সূন্দর রূপ পৃথিবীর আর
কোথাও নেই।

ଅନୁଶୀଳନୀ

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ଇଲଶେଗୁଡ଼ି ମୁଖଲଧାରେ ପେଂଜା ତୁଲୋ ସଡ଼ଖତୁ ବର୍ଷାକାଳ ଅସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ
ପାଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନବାନ୍ନ



২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বছরে কয়টি খন্তু আসে-যায়?

খ. বছরের বারো মাসের নাম বলি এবং লিখি।

গ. কোন কোন মাস নিয়ে কোন কোন খতু হয়? বলি এবং লিখি।

ঘ. আমার দেখা বর্ষা ও শীত ঋতুর তলনা করিঃ।

ঙ. কোন খতু আমার বেশি পছন্দ? পছন্দের কারণ কী? লিখে জানাই।

৩. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

ক. আমাদের দেশ দেশ।

খ. গীর্ঘকে বলা হয়

গ. বৰ্ষায় ফোটে নানা ফল।

ঘ ত্রেষুণ্ড আর্ট |

১৫ শীতকালে হাওয়া বয়।

সোনালি ধানের

উত্তর

ষড়খণ্ড

কদম কেয়া ও আবও

মধ্যমাস

৪. ডান দিক থেকে শব্দ বেঢ়ে নিয়ে খী দিকের শব্দের সঙ্গে মেলাই।

যাওয়া	ফুরফুরে বাতাস
খেজুরের	আসা
বসন্তকাল	প্রচণ্ড গরম
পিঠা	রস
গ্রীষ্ম	পুলি

৫. নিচের ছকের খালি ঘরে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঝতুর নাম লিখি।

বৈশিষ্ট্য	ঝতুর নাম
আকাশ তখন কালো ঘন মেঘে ছেয়ে যায়।	
নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে যায়।	
রৌদ্রের অসহ্য তাপ।	
এই ঝতুতে খেজুরের রস দিয়ে তৈরি হয় নানা পিঠাপুলি।	
এ সময়ে কৃষকের ঘর সোনালি ফসলে ভরে ওঠে।	
গাছে গাছে জেগে ওঠে নতুন সবুজ পাতা।	

৬. নিচের বাক্যটি পড়ি এবং বিশেষ ও বিশেষণ পদ সম্পর্কে জেনে নিই।

কোকিলের ডাক মিষ্টি।

ব্যক্তি, বস্তু, সময় বা স্থানের নাম হলেই তা বিশেষ। উপরের বাক্যটিতে **কোকিল** হলো বিশেষ পদ। কিন্তু কোকিলের ডাক কেমন? মিষ্টি। এটি বিশেষণ পদ। যে শব্দ বিশেষ পদের কোনো গুণ বা চরিত্র প্রকাশ করে, সেটিই বিশেষণ। এখানে বিশেষণ পদ হচ্ছে **মিষ্টি**।

বিশেষ	বিশেষণ
কোকিল	মিষ্টি

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি। বিশেষ পদগুলোকে গোল (○) চিহ্ন দিয়ে ও বিশেষণ পদগুলোর নিচে দাগ চিহ্ন (—) দিয়ে চিহ্নিত করি।

- ক. তখন হাড় কাঁপানো শীত।
- খ. আকাশ হয়ে ওঠে ঘন নীল।
- গ. ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয়।
- ঘ. গ্রীষ্মে মিষ্টিফল পাওয়া যায়।

৭. কর্ম অনুশীলন।

আমার দেখা চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

ପାଲକିର ଗାନ

ସତ୍ୟସ୍ନାଥ ଦସ୍ତ

ପାଲକି ଚଲେ!

ପାଲକି ଚଲେ!

ଗଗନ ତଳେ

ଆଗୁନ ଜୁଲେ!

ମୁଖ ଗୀଯେ

ଆଦୁଲ ଗାୟେ

ଯାଚେ କାରା

ରୌଦ୍ରେ ସାରା!

ମୟରା ମୁଦି

ଚକ୍ର ମୁଦି,

ପାଟାଯ ବସେ

ଢୁଳଛେ କୟେ !

ଦୂରେର ଚାହି

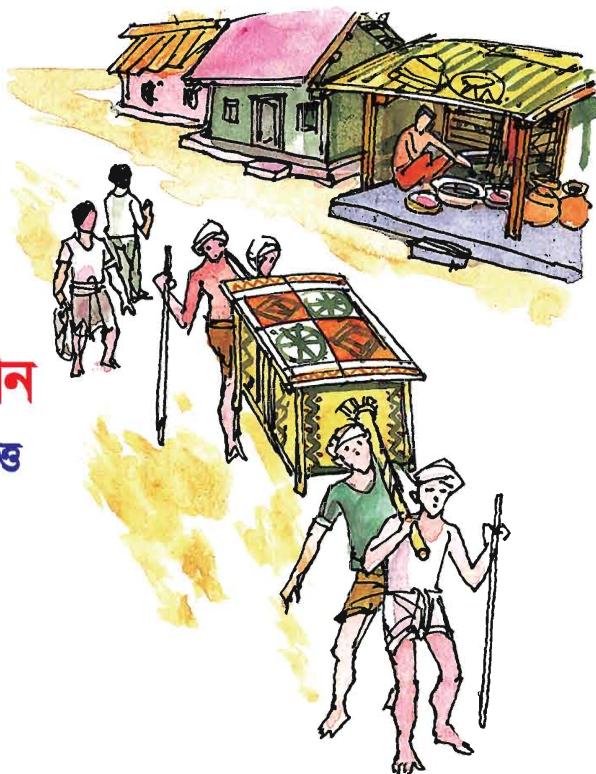
ଶୁଷଚେ ମାଛି,—

ଉଡ଼ିଛେ କତକ

ଭନଭନିଯେ ।—

ଆସଛେ କାରା

ହନହନିଯେ ?



ହାଟେର ଶେଷେ

ବୁକ୍ଷ ବେଶେ

ଠିକ ଦୁଧରେ

ଧାଯ ହାଟୁରେ !

କୁକୁରଗୁଲୋ

ଶୁକଛେ ଧୁଲୋ,—

ଶୁକଛେ କେହ

କ୍ଲାନ୍ତ ଦେହ ।

ଗଜା ଫଡ଼ି

ଲାଫିଯେ ଚଲେ;

ବାଧେର ଦିକେ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଲେ ।

ପାଲକି ଚଲେ ରେ !

ଅଞ୍ଚା ଚଲେ ରେ !

ଆର ଦେଇ କତ ?

ଆରଓ କତ ଦୂର ?

(ସଂକ୍ଷେପିତ)



অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

পালকির বেহারারা পালকি কাঁধে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান। চলার পথে পা মেলাতে তারা তালে তালে গান গাইছেন। এই গানের কথায় গ্রামবাংলার চলমান জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গগন আদুল পাটা ভনভনিয়ে কষে হাটুরে ধুকছে অজা সত্ত্ব ধায় শুষছে

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পাটার ময়রা আদুল হাটুরেরা গগনে দুধের চাঁছি পালকি

ক. সকালে পূর্ব সূর্য ওঠে।

খ. শিশুরা বাড়ির উঠানে গায়ে খেলা করছে।

গ. উপর বসে দোকানদার জিনিস বিক্রি করছেন।

ঘ. মনের আনন্দে মিষ্টি বানাচ্ছেন।

ঙ. হাটের শেষে বাড়ি ফিরছেন।

চ. খোকা খেতে ভালোবাসে।

ছ. চড়ে বউ নাইওরে যান।

৪. যুক্তবর্ণগুলো দেখি। যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

স্তৰ	<table border="1"><tr><td>স্ত</td></tr></table>	স্ত	<table border="1"><tr><td>স</td></tr></table>	স	<table border="1"><tr><td>ত</td></tr></table>	ত	ব্যস্ত, সস্তা
স্ত							
স							
ত							
	<table border="1"><tr><td>শ্ব</td></tr></table>	শ্ব	<table border="1"><tr><td>ব</td></tr></table>	ব	<table border="1"><tr><td>ধ</td></tr></table>	ধ	লঞ্চ, ক্ষৰ্ষ
শ্ব							
ব							
ধ							
ঝৌদু	<table border="1"><tr><td>দ্র</td></tr></table>	দ্র	<table border="1"><tr><td>দ</td></tr></table>	দ	<table border="1"><tr><td>ঢ</td></tr></table>	ঢ	(র-ফলা) নিৰ্দ্রা, ভদ্ৰ
দ্র							
দ							
ঢ							
ক্লান্ত	<table border="1"><tr><td>ক্ল</td></tr></table>	ক্ল	<table border="1"><tr><td>ক</td></tr></table>	ক	<table border="1"><tr><td>ল</td></tr></table>	ল	ক্লাস, ক্লেশ
ক্ল							
ক							
ল							
	<table border="1"><tr><td>ত্ত</td></tr></table>	ত্ত	<table border="1"><tr><td>ন</td></tr></table>	ন	<table border="1"><tr><td>ত</td></tr></table>	ত	শান্ত, পাতা
ত্ত							
ন							
ত							

৫. নিচের শব্দগুলো দেখি। এ ধরনের আরও কয়েকটি শব্দ লিখি।

- ক. শনশন
- খ. হনহন
- গ. পিঙাপিঙ
- ঘ.
- ঙ.
- চ.

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. দুপুরের মোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে?
- খ. পাটায় বসে ময়রা কী করছেন?
- গ. হাঁটুরে কোথায় যাচ্ছেন?
- ঘ. কুকুরগুলো ধূকছে কেন?

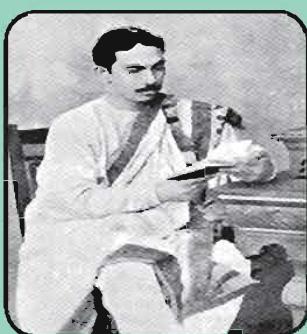


৭. বই দেখে ছন্দের তালে তালে কবিতাটি বারবার পড়ি।

৮. কবিতাটি না দেখে আবৃত্তি করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

“পালকির গান” কবিতার অনুকরণে আমি একটি ছড়া বা কবিতা লেখার চেষ্টা করি।



কবি-পরিচিতি

কলকাতার কাছে নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় ছন্দের দোলা ও শব্দের ঝংকার খুব ভালো লাগে। তাঁকে ‘ছন্দের যাদুকর’ বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘কুহু ও কেকা’, ‘অভ-আবীর’, ‘হসন্তিকা’ উল্লেখযোগ্য। “পালকির গান” কবিতাটি ‘কুহু ও কেকা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কবি মৃত্যুবরণ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বড় রাজা ছেট রাজা

দুই রাজা, বড় রাজা আর ছেট রাজা। দুজনে একদিন দিগ্বিজয় করতে চললেন। বড় রাজা চললেন বড় বড় হাতি-ঘোড়া, কামান-বন্দুক সাজিয়ে। মন্ত জয়চাক পিটিয়ে বড় বড় সেনাপতির সঙ্গে, বড় বড় রাজ্য জয় করতে করতে।



এদিকে ছোট রাজা চললেন সাধারণ মানুষজনের সাজে। ছোট ছোট কামান-বন্দুক, হাতি-ঘোড়া নিয়ে ছোট একটি পুঁটলি বেঁধে। ছোট রাজ্য জয় করতে।

মন্ত বড় এই পৃথিবী – বড় রাজা ক্রমে ক্রমে তা জয় করে ফেললেন। এমন সময় চর এলো, খবর দিল। মহারাজ, শুনে এলাম, ছোট রাজা ছোট রাজ্য নিয়ে সুখে রয়েছেন। বড় রাজা বললেন, “তাকে গিয়ে বলো, আমি এই পৃথিবীটা জয় করে নিয়েছি। সে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাক।”

দূত গেল ছোট রাজার কাছে। কিন্তু ছোট রাজার সে রাজ্য এত ছোট যে দূত দেখতেই পেল না। কোথায় রাজা! কোথায় রাজত্ব! সে ফিরে এসে বড় রাজাকে খবর দিল – চক্ষুর অগোচর সে রাজত্ব। সেখানে প্রবেশ করা ভারি কঠিন।

বড় রাজা বড়ই খাপ্পা হয়ে বললেন, “চলো আমি নিজে যাব।”

বড় রাজা মন্ত মন্ত হাতি-ঘোড়া, রথ-রথী নিয়ে চললেন পৃথিবী কাঁপিয়ে। কিন্তু ছোট রাজ্য এতটাই ছোট যে সেখানে হাতি ঘোড়া কিছুই চলে না। মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিল –“সবার চোখে অণুবীক্ষণ লাগিয়ে যুদ্ধে চলো!”

সেনাপতি বললেন, “এতে করে চোখ চলবে, গোলাগুলি চলার উপায় হবে না।”

রাজা বললেন, “দেখাই যাক না।”

যুদ্ধ বাঁধল – সেনাপতির পায়ের তলা দিয়ে ছোট রাজার ফৌজ গলে পালাল। তীর-কামান আস্দাজ করতে না পেরে বাতাসে হানা দিতে থাকল। নয়তো আকাশে ঝুপঝাপ বড় রাজার ছাউনির উপর পড়তে লাগল। বড় বড় অস্ত্র–সেসব অস্ত্র বড় জিনিসকেই লক্ষ করে। ছোটকে দেখতে পায় না। বড় রাজা, বড় বড় মন্ত্রী, বড় বড় সেনাপতি ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ছোট রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। ছোট রাজা হেসে বললেন, “আপনি আপনার মন্ত রাজত্ব নিয়ে সুখে থাকুন। ছোটতে-বড়তে সন্ধি হলে কী হয় তা জানেন না কি?”

বড় রাজা বললেন, “তা কি আর জানিনে?”

সেনাপতি বললেন, “এত বড় পৃথিবীটা জয় করে এলেন বড় রাজা। ওইটুকু আর জানেন না?”

ছোট রাজা বললেন, “তাহলে এবারকার মতো এতটুকু জেনেই ঘরে চলে যান সকলে। আরও কী জানতে চান?”



বড় রাজা রেগে বললেন, “ছোটকে টুটি চেপে ধরলে কী করে তাই জানাতে চাই।” বলেই বড় রাজা নিজের মন্ত মুঠোয় রাজ্যসহ ছোট রাজাকে কষে চেপে ধরলেন। বড় রাজার মোটা মোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতোই সব গলে পালালো। ছোট রাজা, তার রাজসিংহাসন রাজপুরী সমন্তই বেরিয়ে গেল। বড় রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি। বুড়ো আঙুলের গোড়ায় মৌমাছির হুলের মতো একটা কী বিঁধে রয়েছে। যন্ত্রণায় বড় রাজার আঙুলটা দেখতে দেখতে ফুলে ঢেল ঝুঝয়ে উঠল।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খৌজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগ্বিজয় সেনাপতি রাজত্ব জয়টাক চর দৃত অগোচর খাপা মন্ত্রণা
অনুবীক্ষণ ফৌজ অন্ত সন্ধি রথ-রথী ঝুপঝাপ রাজ্য মুঠো

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফাঁপরে অন্যত্র আন্দাজ জয়টাক দিগ্বিজয় রাজসিংহাসনে

ক. সমন্ত ছোট রাজ্য জয় করে রাজা বসলেন।

খ. রাজার খামখেয়ালিতে মন্ত্রী পড়লেন।

গ. রাজা করে এসেছেন।

ঘ. শিকারের খৌজে রাজা যাচ্ছেন।

ঙ. রাজ্য জয়ের আনন্দে চারিদিকে বাজছে।

চ. রাজা করলেন ছোট রাজা পালিয়ে যেতে পারেন।

৩. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

মন্ত	ন্ত	স	ত	আন্ত, গোন্ত
বন্দুক	ন্দ	ন	দ	নিন্দুক, বিন্দু
রাজ্য	জ্য	জ	ঝ (য-ফলা)	জ্যাকেট, জ্যামিতি
ক্রমে	ক্ৰ	ক	ঞ (ৱ-ফলা)	চক্র, বক্র
খাপা	প্প	প	প	ধাপা, বেখাপা

৪. বাক্য রচনা করি।

রাজ্য চর রথ মুঠো রাজসিংহাসন

৫. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে বাক্য পড়ি ও শিখি।

বড় রাজা আর ছোট রাজা
ক্রমে ক্রমে মন্ত বড় এই পৃথিবী
ছোট শহর এতটাই ছোট যে
বড় রাজার আঙুল ফুলে
বড় বড় অস্ত

সেখানে হাতি চলে না, ঘোড়া চলে না।
চোল হয়ে উঠল।
বড় জিনিসকেই লক্ষ করে।
বড় রাজা জয় করে ফেললেন।
দিগ্বিজয় করতে চললেন।

৬. একই শব্দের ভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

চর	-	দৃত
চর	-	নদীর চর
চলা	-	পায়ে হাঁটা
চলা	-	চালিত হওয়া



৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও শিখি।

- ক. বড় রাজা কীভাবে রাজ্য জয় করতে বের হলেন?
- খ. বড় রাজা ছোট রাজার উপর রেগে গেলেন কেন?
- গ. বড় রাজা কেন ছোট রাজ্যকে জয় করতে পারলেন না?
- ঘ. বড় রাজা কেন সন্ধি করতে চাইলেন?
- ঙ. বড় রাজা আর ছোট রাজার মধ্যে তোমার কাকে বেশি পছন্দ? কেন?

৮. অল্প কথায় গল্পটা বলি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

- ক. শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি—বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বির্তক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।
- খ. বড় রাজা এবং ছোট রাজার ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাই।



বাংলার খোকা

মমতাজউদ্দীন আহমদ

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। দিনটি ছিল বুধবার।
গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়। সেই গ্রামের শেখ পরিবারে
জন্ম হলো একটি শিশুর। বাবা শেখ লুৎফুর রহমান আদর
করে শিশুর নাম রাখলেন খোকা। খোকা খুব আদরের
নাম। বাংলার প্রায় সব ঘরেই প্রথম পুত্রসন্তানের নাম
রাখা হয় খোকা।

দিনে দিনে বড় হয় খোকা। পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়। দুচোখ মেলে দেখে বাংলার মাঠ-ঘাট,
পথ-প্রান্তর, সোনালি ধানের খেত। চোখ জুড়িয়ে যায় তার।

যত বড় হয় খোকা, তত তার বন্ধুর সংখ্যা বাঢ়ে। গাঁয়ের অনেক ছেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ
নিবিড় হয়। প্রায়ই সে বন্ধুদের বাড়ি নিয়ে আসে। বলে, মা, ওদের খেতে দাও। মা আনন্দের
সঙ্গে ছেলের বন্ধুদের খেতে দেন। মা হাসিমুখে ছেলের আবদার পূরণ করেন।

বর্ষাকালে স্কুলে যেতে বাবা খোকাকে ছাতা কিনে দিলেন। খোকা ছাতা নিয়ে স্কুলে যায়। একদিন
ছাতা ছাড়া ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরল খোকা।

মা জিজ্ঞেস করলেন, “তোর ছাতা কই বাবা? এমন
ভিজেছিস কেন?”

খোকা হাসিমুখে বলল, “মাগো, আমার এক গরিব
বৃন্দুর ছাতা নেই। আমার ছাতাটা ওকে দিয়েছি।”

মা ছেলের এমন উদারতায় খুশি হয়ে ওকে
জড়িয়ে ধরেন। বললেন, “ভালোই করেছিস
বাবা! তোর বাবাকে বলব তোকে আর একটা
ছাতা কিনে দিতে।”

মা ছেলের কপালে চুমু খেলেন।



শীতের সময় খোকাকে একটা চাদর কিনে দিলেন বাবা। একদিন দেখা গেল চাদর ছাড়াই বাড়ি
ফিরে এলো খোকা। মা বললেন, “তোর চাদর কই বাবা?” খোকা বুক ফুলিয়ে বলে, “মাগো, পথের
ধারে গাছের নিচে এক বৃন্দু মহিলা! শীতে খুব কাঁপছিল।” আমি তার গায়ে চাঁদরটি জড়িয়ে দিয়ে
এসেছি।

মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, গরিব মানুষের জন্য ছেলেটির এত দরদ!
ও নিশ্চয় বড় হয়ে মানুষের জন্য অনেক কিছু করবে।

খোকার বন্ধু জেলের ছেলে গোপাল করুণ সুরে বাঁশি বাজায়। খোকা বন্ধুকে বলে, “তোর বাঁশির সুরে আনন্দ নেই কেন রে গোপাল?”

গোপাল হতাশ হয়ে বলে, “আমার চারদিকে মানুষের জীবনে আনন্দ নেই রে খোকা।”

খোকা নিশ্চুপ থেকে ভাবে, “তাই তো। আমার চারদিকে এমন অবস্থাই তো দেখছি। এই অবস্থা বদলাতে হবে।”

দেশের নানা কথা ভাবতে ভাবতে বড় হয় খোকা। স্কুল পার হয়ে কলেজে ঢোকে। বাংলার মানুষের কথা, দেশের কথা তাঁকে নিয়ত ভাবায়। তিনি পার হন কলেজের চৌকাঠ। আরও বড় হন তিনি। যুক্ত হন রাজনীতির সঙ্গে। গরিব মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য আন্দোলন করেন। দেশের মুক্তির জন্য ১৯৭১ সালে ডাক দেন স্বাধীনতার।

এই খোকা আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই আমাদের জাতির পিতা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পথ-প্রান্তর আবদার উদারতা মুগ্ধ দরদ করুণ হতাশ জেলা চৌকাঠ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আবদার নিবিড় করুণ উদারতা হতাশ জেলা মুগ্ধ দরদ

ক. বন্ধুর সাথে সম্পর্ক হওয়াই ভালো।

খ. ছেলের শুনে মা হতবাক হয়ে গেলেন।

গ. মানুষকে মহান করে।

ঘ. নাটকটি দেখে আমি হয়েছি।

ঙ. ছেট বোনটির জন্য ভাইয়ের অনেক |

চ. বাস দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখে চোখে জল এসেছে।

ছ. সামান্য কারণেই হওয়া ঠিক নয়।

জ. আমাদের সব দিক থেকে সমৃদ্ধ।

৩. বাক্য গঠন করি।

আদর সোনালি কপাল চাঁদর গরিব আনন্দ রাজনীতি জনক

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়?

খ. বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কী আবদার করত?

গ. বৃন্দ মহিলা কোথায় শীতে কাঁপছিল? খোকা তাকে কীভাবে সাহায্য করে?

ঘ. খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফেরে কেন?

ঙ. কে স্বাধীনতার ডাক দেন?

৫. বিপরীত শব্দ বলি ও খাতায় লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
বন্ধু
আনন্দ
ভেঙা
গরিব
নিচে
দুঃখ
স্বাধীনতা

৬. বজাৰমধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই মানুষকে ভালোবাসতেন – এমন দুটি ঘটনার কথা খাতায় লিখি।

৭. আগের পাঠে আমরা বিশেষ ও বিশেষণ পদ শিখেছি। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ ও বিশেষণ পদ চিহ্নিত করি এবং খাতায় লিখি।

ঘর সোনালি স্কুল ছাতা বড় চাদর বাঁশি গাছ হতাশ উদার মুখ চৌকাঠ করুণ

৮. কর্ম-অনুশীলন।

খোকা গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, আমরা নিজেরা গরিব মানুষের জন্য কে কী করতে পারি তা লিখি।



মমতাজউদ্দীন
আহমদ

লেখক-পরিচিতি

মমতাজউদ্দীন আহমদ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। তাঁর রচিত কয়েকটি নাটক হচ্ছে: ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’, ‘সাত ঘাটের কানাকড়ি’ প্রভৃতি। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কার লাভ করেছেন।

মুক্তির ছড়া

সানাউল হক

আমার বাংলা তোমার বাংলা
সোনার বাংলাদেশ –

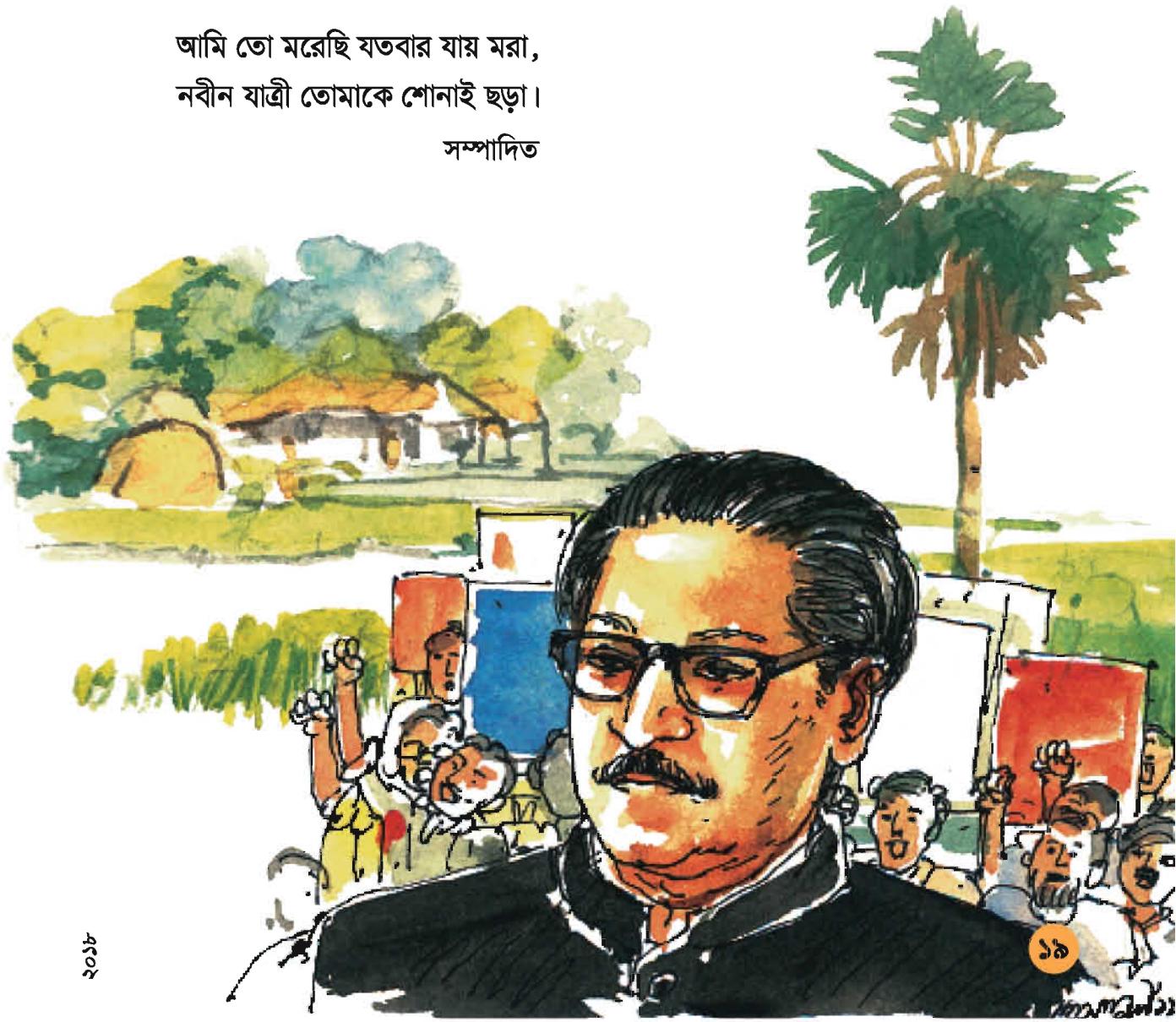
সবুজ সোনালি ফিরোজা ঝুপালি
রূপের নেই তো শেষ।

আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা,
নবীন যাত্রী তোমাকে শোনাই ছড়া।

সম্পাদিত

এদেশ আমার এদেশ তোমার
সবিশেষ মুজিবের,

হয়ত অধিক মুক্তিপাগল
সহস্র শহিদের।



অনুশীলনী

১. কথাগুলো জেনে নিই এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সোনার বাংলাদেশ

— প্রিয় মাতৃভূমি। বাংলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। এ দেশকে নিয়ে আমরা গৌরব করি। এ দেশ প্রচুর সম্পদে ভরা। তাই এই বাংলাকে বলে সোনারবাংলা। আমরা **সোনার বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ করব।**

সবুজ সোনালি ফিরোজা রূপালি — বাংলার প্রকৃতি বিচিত্র ও সুন্দর। প্রকৃতির নানা রঙে যেন সাজানো এ দেশ। সবুজ শস্যে ভরা আমাদের এ মাঠ। পাটের সোনালি আঁশ আমাদের সম্পদ। **কখনও আমাদের প্রকৃতি ধারণ করে ফিরোজা রঙের আভা। আমাদের নদীতে আছে রূপালি ইলিশ।**

যতবার যায় মরা

— বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এ দেশের মানুষকে মরণ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বার বার সহ্য করতে হয়েছে দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার আর নিপীড়ন। তাই মৃত্যু যেন বার বার এসেছে।

নবীন যাত্রী

— যারা নতুন যুগের শিশু। **আমরা নবীন যাত্রী, আমাদের সামনে অনেক স্থপন।**

সবিশেষ মুজিবের

— এ দেশ আমাদের সকলের। এ দেশের স্বাধীনতা সঞ্চারে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। **তাই এ দেশ সবিশেষ অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবন্ধু মুজিবের।**

মুক্তিপাগল

— এদেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সঞ্চার করেছেন। **স্বাধীনতার জন্য তাঁরা অধীর ছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন মুক্তিপাগল।**

সহস্র শহিদের

— মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেইসব হাজার শহিদ। **শত-সহস্র শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।**

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলা হয় কেন?

খ. এ দেশের নানা রূপ কীভাবে দেখতে পাই?

গ. ‘আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা।’ — বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

ঘ. নবীন যাত্রী কারা?

ঙ. এ দেশ মুক্তিপাগলদের। – সেই মুক্তিপাগল কারা?

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই ও লিখি।

শেষ — শুরু

মরা — বাঁচা

নবীন — প্রবীণ

মুক্তি — বন্দি



৪. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি লিখি।

ক. ফিরোজা রূপালি

রূপের নেই তো ।

খ. তোমাকে শোনাই ছড়া।

গ. এদেশ এদেশ

সবিশেষ,

৫. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

৬. আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৭. মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার এলাকায় যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা তৈরি করি।



কবি-পরিচিতি

সানাউল হকের জন্ম ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মে ব্রাজ্জনবাড়িয়া জেলার চাউড়ায়। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি ও ইউনেস্কো পুরস্কার এবং একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সানাউল হক

আজকে আমার ছুটি চাই

শাহীন লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবা-মার কাজে
সাহায্য করে। ওর বোনটা অনেক ছোট। শাহীন
ছোট বোনের সাথেও খেলাধুলা করে। শাহীন নিয়মিত
মাদরাসায় যায়। সেদিন স্কুলে যাওয়ায় সমস্যা
হয়ে গেল। বাবা দূরে গেছেন কাজে, পরের দিন
সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না। এদিকে
বোনটার অসুখ করল। এমন অবস্থায় শাহীন
মাদরাসায় যায় কী করে?

শাহীন দুটি চিঠি লিখল। একটা চিঠি তার ক্লাসের
বন্ধু আবিরকে, অন্যটা তার ক্লাসের স্যারকে।
শাহীনের চিঠিটা স্যারকে পৌছে দেবে আবির।



প্রথম চিঠিটা এরকম:

সফেদপুর

১১.০২.১৪২৩ সন

প্রিয় বন্ধু আবির,
আমি আজ মাদরাসায় যেতে পারব না। আমার ছোট বোনটার খুব অসুখ। আর বাবাও বাড়ি
নেই। কাল সন্ধ্যায় আসবেন। লতিফ স্যারকে চিঠিটা দেবে আর আমার বিপদের
কথা বলবে। দিনের সব পড়া ভালো করে দেখবে ও লিখে নেবে। বাবা বাড়ি এলে
তোমার কাছ থেকে আমি সব পড়া দেখে নেব। তোমার গঞ্জের বইটাও নিয়ে আসব।

আজকে মাদরাসার লাইব্রেরি থেকে খেলার বইটা নিতে ভুলবে না যেন।

ইতি

তোমার বন্ধু
শাহীন

বন্ধু আবিরকে লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে অপর পৃষ্ঠায় লিখল:
আবির হোসেন

**গ্রাম : আড়াইপাড়ু
(উত্তর পাড়া)**

দ্বিতীয় চিঠিটা এ রকম:

তারিখ: ১১.০২.১৪২৩

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

ইছাপুর ইবতেদায়ি মাদরাসা

সফেদপুর

বিষয়: ছুটির আবেদন।

মহোদয়

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার ছোটবোন খুব অসুস্থ। বাবা বাড়ি নেই। তিনি সন্ধ্যায় আসবেন। ছোটবোনকে দেখাশোনা করার জন্য আমার পক্ষে মাদরাসায় আসা সম্ভব নয়।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন, আমাকে আজ ছুটি প্রদান করলে আমি বাধিত হব।

নিবেদক

আপনার অনুগত ছাত্র

শাহীন রহমান

চতুর্থ শ্রেণি

ক্রমিক নম্বর- ০২

স্যারকে লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে একটা খামে ভরল শাহীন।

খামের বাম পাশে লিখল:

প্রেরক
শাহীন রহমান
চতুর্থ শ্রেণি
পিতা : বাদিউর রহমান
গ্রাম : সফেদপুর
জেলা : ঢাকা
পোস্ট কোড : ১৩৪৫

খামের ডান পাশে লিখল:

প্রাপক
জনাব লতিফ আহমদ খন্দকার
প্রধান শিক্ষক
ইছাপুর ইবতেদায়ি মাদরাসা
ডাকঘর : ইছাপুর
জেলা : ঢাকা
পোস্ট কোড : ১৩৪৪

শাহীনের লেখা চিঠিটা পেয়ে আবির সবকিছু ঠিক মতোই করেছিল। আর স্যারকে লেখা চিঠিটা পেয়ে তার শিক্ষক লতিফ সাহেবও ঠিকই জেনে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা। তিনি তার চিঠিটার গায়ে ছুটির কথা লিখে দিয়ে সই করলেন। আবিরকেও স্যার জানিয়ে দিলেন যে, শাহীনকে একদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে।

আমরা প্রয়োজনে এই রকম চিঠি লিখে জরুরি কাজ ও সমস্যা মোকাবিলা করতে পারি। চিঠি লেখার অভ্যাস করতে হয়। জানতে হয় কোন চিঠি কখন, কাকে এবং কীভাবে লিখতে হবে।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

ক. চিঠি কয়েক রকম হতে পারে। যেমন—ব্যক্তিগত চিঠি, পারিবারিক চিঠি, নিম্নরূপ পত্র,
ব্যবসায়িক চিঠি, দাঙ্গরিক চিঠি, অনুরোধ পত্র বা আবেদন পত্র ইত্যাদি।

খ. চিঠির মধ্যে সাধারণত কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন—

১. যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম, ঠিকানা ও তারিখ

২. সম্বোধন বা সম্ভাষণ

৩. মূল বক্তব্য (ভেতরে যে কথাগুলো থাকে)

৪. বিদায় সম্ভাষণ (পত্রের ইতি টানা)

৫. প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) নাম ও ঠিকানা

৬. প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা

গ. চিঠি চলিত ভাষাতেই লেখা উচিত।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. শাহীন কেন চিঠি লিখেছিল?

খ. শাহীন কাকে কাকে চিঠি লিখেছিল?

গ. বন্ধু আবিরকে কেন শাহীন চিঠি লিখেছিল?

ঘ. চিঠি লেখার ফলে শাহীনের কী লাভ হয়েছিল?

ঙ. চিঠিতে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?

৩. শূন্যস্থান পূরণ করি।

চিঠির প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশ.....।

তৃতীয় অংশ.....। চতুর্থ অংশ।

পঞ্চম অংশ। ষষ্ঠ অংশ।

৪. পত্র লিখি

ক. দাদুর কাছে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখি।

খ. পাশের মাদরাসার সাথে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলা দেখার জন্য চতুর্থ শ্রেণির পক্ষ থেকে ছুটি
চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদন পত্র লিখি।

গ. লিখল, দেবে, করছে, দেখবে, আসব, পারছি, লিখব, করলেন, জানতে – এগুলো
সবই চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ, যার দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায়।

বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা

১৯৭১ সালের ২৬ এ মার্চ। অবিস্মরণীয় সেই সময়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে শুরু হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ। বাংলিরা ঝাপিয়ে পড়েছেন স্বাধীনতার মরণপণ যুদ্ধে। সারা বাংলাদেশ তখন রণক্ষেত্র। হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বেতাবেই হোক পরাজিত করতে হবে। শত্রুমুক্ত করতে হবে এই প্রিয় বাংলাদেশকে। বাংলাদেশ অর্জন করবে স্বাধীনতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব পেশার মানুষ যোগ দিচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধে। এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা, গঠিত হয়েছে মুক্তিবাহিনী। এঁদের সবাই জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের অনেকেই শহিদ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সাতজনকে অসীম সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্র বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করে। এই বীরশ্রেষ্ঠরা হলেন— মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, মোস্তফা কামাল, হামিদুর রহমান, মোহাম্মদ বুকুল আমিন, মতিউর রহমান, মুশী আবদুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ। এখানে আমরা তিনজন বীরশ্রেষ্ঠের কথা জানব।



ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ। একজন মুক্তিযোদ্ধা চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারঘরিয়ার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে বের হয়ে রেহাইচরের কাছ দিয়ে নৌকায় করে মহানন্দা নদী পার হন। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্তার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বাজ্জারে আক্রমণ চালান। ধ্বংস করেন তাদের সুরক্ষিত বাজ্জার। পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটিতে এ খবর পৌছালে তারা অধিক সংখ্যক সৈন্য এনে পাল্টা আক্রমণ চালায়। সাহসী যোদ্ধা আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠেন। পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। আকম্ভিকভাবে পাকিস্তানি সেনাদের গুলি এসে তাঁর কপালে লাগে। তিনি মাটিতে পড়ে যান। এই খবর বারঘরিয়া মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌছালে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাগণ পাকিস্তানি সেনাদের উপর মরণপণ আক্রমণ চালান। ওই দিনই তাঁরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর হানাদার মুক্ত করেন।

শহিদ হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। বীরের রক্তে রঞ্জিত হলো বাংলার মাটি। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা অসীম সাহসী এই বীরের নাম ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম ১৯৪৯ সালের ৭ই মার্চ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহিমগঞ্জ গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। সিন্ধুন্ড নিলেন তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা চার জন তরো জুলাই তারিখে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের শিয়ালকোট হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে দিল্লি হয়ে কলকাতায় পৌছান। চারজন বীর সেনাকে স্বাগত জানান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে পাঠানো হয় ৭ নম্বর সেক্টরে। সেখান থেকে তিনি মালদহ জেলার মেহেদিপুর মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে যোগ দেন। তিনি এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। তাঁর সাহস ও ক্ষিপ্তার কারণে আক্রমণের ধারা ছিল ভিন্ন। অনেকগুলো অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়ে শত্রুসেনাদের খতম করেছেন তিনি। সেক্টর কমান্ডার কাজী নুরুজ্জামান তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ‘মহিউদ্দিন ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক এবং যোগ্য সেনানায়ক। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মেহেদিপুর সাব-সেক্টরের চেহারা পাল্টে গেল।’ বিজয় দিবসের দুই দিন আগে এই অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।



ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের মতোই ভাবনা ছিল বৈমানিক মতিউর রহমানের। তিনিও চেয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে যুদ্ধবিমান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে মতিউর ছাত্রদের বিমান প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর একজন ছাত্রের নাম ছিল রশিদ মিনহাজ। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে, মিনহাজ যেদিন বিমান নিয়ে আকাশে উড়বে, সেদিন মিনহাজের কাছ

থেকে বিমানটি ছিনিয়ে ভারতে নিয়ে যাবেন। নোটিশ বোর্ডে
টানানো ফ্লাইট শিডিউল দেখে তিনি জেনেছিলেন আগস্ট
মাসের ২০ তারিখে মিনহাজ আকাশে উড়বে। সেদিন
তিনি গাড়ি নিয়ে রানওয়ের পূর্বদিক চলে যান। মতিউর দেখতে
পান মিনহাজ টি-৩৩ বিমান চালিয়ে সামনের দিকে আসছে।
তিনি বিমানের সামনে গিয়ে ওকে থামতে বলেন মিন-হাজ
থামে এবং বিমানের উপর ঢাকনা খুলে কোনো সমস্যা
হয়েছে কি না তা জানতে চায়। সুযোগ পেয়ে মতিউর লাফ
দিয়ে বিমানে ওঠেন। আগেই বুমালে ক্লোরোফরম মাখিয়ে
এনেছিলেন তিনি। মিনহাজের নাকে বুমাল চেপে ধরতেই
সে অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই মিনহাজ কন্ট্রোল টাওয়ারে খবর পাঠায় যে বিমানটি
হাইজ্যাক হয়েছে। মতিউর রহমান খুব নিচু দিয়ে অনেকটা আসার পরে মিনহাজের জ্ঞান
ফিরে। সে বিমানটিকে ফেরানোর জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে। বিমানটি পাকিস্তানের থাট্টায়
বিধ্বস্ত হয়। বিধ্বস্ত বিমানের বাইরে পড়ে ছিল মতিউরের প্রাণহীন দেহ। পরে তাঁকে
বিমানঘাঁটিতে কবর দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে তাঁর দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।
রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় ঢাকার মিরপুরের শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে।

১৯৪১ সালে ঢাকায় মতিউর জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ছিলেন পাকিস্তান
বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।

মুক্তিযুদ্ধের আরেক অসীম সাহসী যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান। ১৯৫৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি
তিনি বিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার খর্দ খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃসাহসিক এক
যুদ্ধে তিনি জীবন দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৮ এ অক্টোবর। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়ি।
মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেন, গুরুত্বপূর্ণ এই ফাঁড়িটি দখল করতে হবে। দায়িত্ব দেওয়া হলো প্রথম
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর। নেতৃত্ব দেবেন তরুণ সিপাহি হামিদুর রহমান। তিনি প্লাটুন
সৈন্য নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। রাতের আঁধারে অত্যন্ত সাবধানে তাঁরা গ্রেনেড ছুঁড়ে শত্রুর
বাজ্জার নিশ্চক্ষ করে দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তখনই শত্রুর পুতে রাখা একটা মাইন
বিস্ফোরিত হয়। পাকিস্তানি সেনারা সতর্ক হয়ে যায়। দুই পক্ষে বেধে যায় তুমুল যুদ্ধ।



ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান



সিপাহি হামিদুর রহমান

হামিদুরের সঙ্গে শুধু একটা রাইফেল আর দুটো গ্রেনেড। নির্ভুল নিশানায় তিনি প্রথম গ্রেনেডটা ছুঁড়েন। শত্রুর আক্রমণকে স্তব্ধ করে দেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ছোঁড়ার মুহূর্তে শত্রুর মেশিনগানের গুলি এসে লাগে তাঁর গায়ে। শহিদ হন এই অকৃতোভয় বীর। সিপাহি হামিদুরকে প্রথমে ত্রিপুরার আমবাসা ইউনিয়নের হাতিমারাছড়া গ্রামে সমাহিত করা হয়। ২০০৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তাঁর দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনা হয় বাংলাদেশে। পরদিন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে পুনরায় সমাহিত করা হয়।

তিনজন বীরশ্রেষ্ঠের কথা জানলাম আমরা। এক মহান বীরগাথার রচয়িতা তাঁরা। তাঁদের মতো অনেকের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এই বীরদের মহান আত্ম্যাগ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

বীরশ্রেষ্ঠ বাঞ্চার বীরগাথা ধূলিসাং রংক্ষেত্র মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রণ
অতিরুম বিধ্বস্ত হওয়া দুঃসাহসিক বিস্ফোরণ মেশিনগান অকৃতোভয়
মরণপণ আত্ম্যাগ।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) বীরশ্রেষ্ঠরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন?

খ. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন –
বর্ণনা করি।

গ. যুদ্ধবিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে মতিউরের কী ঘটেছিল?

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান যে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তার বর্ণনা দিই।

ঙ. এক মহান বীরগাথার রচয়িতা তাঁরা – ব্যাখ্যা করি।

৩. তারিখবাচক শব্দ শিখি।

লেখাটিতে আছে ‘১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি’ – এখানে ব্যবহৃত ‘২রা’ শব্দটি হলো তারিখবাচক শব্দ। এরকম ১০ পর্যন্ত বলতে ও লিখতে হয় এভাবে :

১লা	(পহেলা)	৬ই	(ছয়ই)
২রা	(দোসরা)	৭ই	(সাতই)
৩রা	(তেসরা)	৮ই	(আটই)
৪ঠা	(চোঠা)	৯ই	(নয়ই)
৫ই	(পাঁচই)	১০ই	(দশই)

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাংলাদেশের কোন নেতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন ?

১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৩. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
৪. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে যুদ্ধ করেছিলেন ?

১. মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়েছিলেন
২. ট্যাঙ্ক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন
৩. পাকিস্তানি সেনাদের বাঞ্কারে আক্রমণ চালিয়েছিলেন।
৪. বিমান থেকে আক্রমণ করেছিলেন



গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ কতজন ?

- | | |
|---------|---------|
| ১. ৩ জন | ২. ৫ জন |
| ৩. ৭ জন | ৪. ৯ জন |

ঘ. মতিউর রহমানের বিমানটি কোথায় বিধ্বস্ত হয়েছিল ?

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ১. ভারতের শ্রীনগরে | ২. পাকিস্তানের থাটায় |
| ৩. বাংলাদেশের মেহেরপুরে | ৪. ভারতের ত্রিপুরায় |

ঙ. কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়িটি দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে ?

- | | |
|------------------------|------------------|
| ১. হামিদুর রহমান | ২. মতিউর রহমান |
| ৩. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর | ৪. মোস্তফা কামাল |

৫. বড়দের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানার চেষ্টা করি ও তা শুনে এসে বন্ধুদের কাছে
বলি।

৬. নিচের ছবিটি অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার ভাবনা লিখে জানাই।



মহীয়সী রোকেয়া

সে অনেক দিন আগের কথা। রংপুরের পায়রাবন্দ
গ্রাম। সেই গ্রামেই জন্ম হলো এক ফুটফুটে শিশুর।
নাম তার রোকেয়া। রোকেয়ার দুই বোন আর দুই
ভাই। বাবা জমিদার। কিন্তু সেই জমিদারি তখন
পড়তির দিকে। আগের অবস্থা আর নেই।

রোকেয়ার সকালে ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে। পাখিদের
তো ডানা আছে। পাখিরা উড়তে পারে। যখন যেখানে
খুশি যেতে পারে। কিন্তু রোকেয়ার তো কোথাও যাবার
অনুমতি নেই। ঘরের বাইরে তো দূরের কথা, কারো
সামনে যাওয়াও নিষেধ। এমনকি সে যদি মেয়ে হয়,
তার সামনেও নয়।



মহীয়সী রোকেয়া

একবার হলো কী, কয়েকজন মেয়ে-আতীয় রোকেয়াদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। রোকেয়ার
বয়স তখন পাঁচ বছর। চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি রোকেয়ার তো খুশি হবার কথা। কিন্তু তাকে
কখনো চিলেকেঠায়, কখনো সিঁড়ির নিচে, কখনো দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হলো।
ছেলে মেয়ে কারো সামনে আসাই যে নিষেধ। মেয়েদের যে এভাবে চলতে হতো, একেই
বলে অবরোধ পথ। অবরোধ মানে বাড়ির নির্দিষ্ট গঞ্জির মধ্যে আটকে থাকা। শুধু মেয়ে
হবার কারণে রোকেয়াকে এভাবে কাটাতে হতো বন্দিজীবন। সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ারও
চল ছিল না।

আসলে মুসলমান মেয়েদের তখন স্কুলে যেতেই দিতেন না অভিভাবকরা। রোকেয়া স্কুলে
যাবেন কী করে? লেখাপড়াই-বা শিখবেন কীভাবে?

কিন্তু তিনি তো দমবার পাত্রী নন। বাড়িতে কুরআন পড়া শিখলেন। উর্দুও শিখেছিলেন। কিন্তু
বাংলা শেখার জন্যে তাঁর মন ছটফট করতে লাগল। রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা, জ্যোষ্ঠ
ভাতা ইব্রাহিম সাবের। করিমুন্নেসা তাঁর বড় ভাইয়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। ভাই
বোন দুজনেই রোকেয়াকে খুবই স্নেহ করতেন। এই ভাই-বোনের কাছেই রোকেয়ার যত
আবদার। রোকেয়ার লেখাপড়া করার কী অদম্য আগ্রহ! বড় বোনের কাছে



তিনি বাংলা শিখলেন। সেই লেখাপড়াটা ছিল আরেক যুদ্ধ। রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন। বাবা-মা তখন গভীর ঘুমে। সারা বাড়ি নিজসুম। মোমবাতি জ্বালিয়ে রোকেয়া বই খুলে বসেছেন। এ বই সে বই থেকে ভাই সাবের তাকে পাঠ দিচ্ছেন। জ্ঞানের জন্যে তৎঙ্গার্থ বোন রোকেয়া শিখছেন কতো কিছু। রাতের পর রাত এভাবেই কেটে গেছে। কখনো কখনো পড়তে পড়তে ভোর হয়ে গেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে এভাবেই পড়া শিখছেন রোকেয়া।

আসলে সেই সময়টা ছিল এমনই। মেয়েদের না ছিল লেখাপড়ার অধিকার, না ছিল বাইরে কোথাও বেরোবার স্বাধীনতা। সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারত না। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো খুব অল্প বয়সে। এভাবেই বড় বোন করিমুন্নেছার চৌদ্দ বছর বয়সে

বিয়ে হয়ে গেল ।

রোকেয়ার বিয়ে হলো ঘোলো বছর বয়সে । স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন । সরকারি চাকুরে । এবার স্বামীর নামানুসারে তাঁর নাম হলো রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন । বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে শশুরবাড়ি যাওয়ার পালা । স্বামীর বাড়ি ভাগলপুর পৌছে দেখলেন বাড়িতে সবাই উর্দুতে কথা বলেন । রোকেয়াও উর্দুতে কথা বলতে শুরু করলেন । কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা না বললে কি মনের সাধ মেটে ? বাংলা ভাষাকে তিনি একদিনের জন্যও ভুলে থাকতে পারেন নি ।

বিয়ের মাত্র দশ বছর পর রোকেয়ার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু হলো । এবার শুরু হলো রোকেয়ার আরেক জীবন । মুসলমান মেয়েরা তখন অনেক পিছিয়ে । লেখাপড়া করার স্কুল নেই । মৃত্যুর আগে স্বামী কিছু অর্থ রেখে গিয়েছিলেন । স্বামীর মৃত্যুর পর কলকাতায় স্বামীর নামে তাই দিয়ে তিনি মেয়েদের একটা প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন । শুরুতে এই স্কুলের ছাত্রী ছিল মাত্র পাঁচ জন । কিন্তু আস্তে আস্তে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকল । তিনি বুঝতে পারলেন, কেন মুসলমান মেয়েরা এত পিছিয়ে আছে । কতো কথা তাঁর মনে, কতো কিছু বলবার ইচ্ছা । এবার তিনি বাংলা ভাষায় শুরু করলেন লেখালেখি । মনের কথা, মনের ভাবনা সব তুলে ধরলেন তাঁর লেখায় । তাঁর লেখা কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বই হলো—‘মতিচুর’, ‘অবরোধবাসিনী’ ও ‘পদ্মরাগ’ ।

ছোটবেলাতেই দেখেছিলেন, মেয়েদের ঘরে বন্দি করে রাখা হয় । পড়ালেখা করার অধিকার নেই । অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । সারাজীবন মেয়েরা আর কিছুই করতে পারে না । বাইরে কাজ করবার অধিকার তারা পায় না । পড়ালেখা করে ছেলেরা । বাইরে কাজ করে ছেলেরা । মেয়েরাও যে মানুষ, সে-কথাই তারা প্রায় ভুলে যায় । রোকেয়া বুঝেছিলেন, ছেলেদের যে অধিকার, মেয়েদেরও তো সেই অধিকার থাকবার কথা ।

রোকেয়া বলেছেন, একটা গরুর থাকে দুটো চাকা । গাড়ি চলতে হলে চাকা দুটোকে সমান হতে হয় । একটা ছোট আরেকটা বড় হলে সেই গাড়ি চলবে না । মেয়ে আর ছেলে হচ্ছে সেরকমই । ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা যদি পিছিয়ে থাকে সেই সমাজের কোনোদিন উন্নতি হতে পারে না । তিনিই প্রথম মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন ।

রোকেয়া ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন । নারী জাগরণের অগ্রদৃত হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

জমিদার বন্দি চিলেকোঠা স্নেহ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা লেখালেখি উন্নতি
সমাজ অধিকার লড়াই নারী জাগরণ অগ্রদুত মহীয়সী চিরন্মরণীয়

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

অগ্রদুত অধিকার প্রতিষ্ঠা অদম্য অবরোধ

৩. এককথায় প্রকাশ করি।

এই লেখায় “রোকেয়ার পড়ালেখা করার কী অদম্য আগ্রহ!” – এরকম একটা বাক্য রয়েছে।
এই বাক্যে ব্যবহৃত ‘অদম্য’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘যে কোনো কিছুতে দমে না।’ শব্দটি
অনেকগুলো শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এরকম আরও কিছু শব্দ শিখি।

অনেকের মধ্যে	—	অন্যতম।
জানার ইচ্ছা	—	জিজ্ঞাসা।
আকাশে যে চরে	—	খেচর।
বিদ্যা আছে যার	—	বিদ্বান।
ভাতের অভাব যার	—	হাভাতে।
মহান যে নারী	—	মহীয়সী।

৪. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

জ্ঞান	জ্ঞ	জ	ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান, অজ্ঞান
উন্নতি	ন্ন	ন্	ন	অন্ন, ভিন্ন, নবান্ন

৫. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক বাক্যাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে

ষোলো বছর বয়সে।

অবরোধ মানে বাড়ির নির্দিষ্ট

মতিচুর, অবরোধবাসিনী ও পদ্মরাগ।

রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে	রোকেয়ার জন্ম।
রোকেয়ার বিয়ে হলো	নারী জাগরণের অগ্রদূত।
তাঁর লেখা বইগুলো হলো—	শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন।
মহীয়সী রোকেয়া	গান্ধির মধ্যে আটকে থাকা।

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. বেগম রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- খ. বাড়িতে লোক এলে রোকেয়া কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকতেন?
- গ. লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে কে কে সাহায্য করতেন?
- ঘ. রোকেয়া কখন পড়াশোনা করতেন? কীভাবে করতেন?
- ঙ. সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল?
- চ. রোকেয়াকে কেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?
- ছ. নারীশিক্ষা কেন প্রয়োজন? —বুঝিয়ে বলি।

৭. স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া কী কী কাজ করতে শুরু করলেন তা সংক্ষেপে লিখি।

৮. রোকেয়ার জীবনী থেকে আমি কী শিখলাম তা সংক্ষেপে লিখি।

ନେମତନ

ଅନୁଦାନଙ୍କର ରାୟ

ଯାଚ୍ଛ କୋଥା ?
ଚାଥଡିପୋତା ।
କିସେର ଜନ୍ୟ ?
ନେମତନ ।
ବିଯେର ବୁଝି ?
ନା, ବାବୁଜି ।
କିସେର ତବେ ?
ଭଜନ ହବେ ।
ଶୁଧୁଇ ଭଜନ ?
ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ।
କେମନ ପ୍ରସାଦ ?
ଯା ଖେତେ ସାଧ ।
କୀ ଖେତେ ଚାଓ ?
ଛନାର ପୋଲାଓ ।

ଇଚ୍ଛେ କୀ ଆର ?
ସରପୁରିଆର ।
ଆଃ କୀ ଆଯେସ !
ରାବଡ଼ି ପାଯେସ ।
ଏଇ କେବଳି ?
କ୍ଷୀର କଦଲୀ ।
ବାଃ କୀ ଫଳାର !
ସବରି କଲାର ।
ଏବାର ଥାମୋ ।
ଫଜଲି ଆମ୍ବା ।
ଆମିଓ ଯାଇ ?
ନା, ମଶାଇ ।



অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

এই ছড়াটিতে আসলে একটা হাসির গল্প বলা হয়েছে। একজন লোক ভজন গান শুনতে চার্থড়িপোতা নামে একটা জায়গায় যাচ্ছে। পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধু একটার পর একটা প্রশ্ন করছে, আর সে উভর দিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বোবা গেল – ভজন গান শোনার চেয়ে তার অনেক বেশি লোভ ভোজনে, অর্থাৎ ভালো ভালো খাবার খাওয়ায়। তার বন্ধু সঙ্গে যেতে চাইলেও সে তাকে নেয় না। কারণ, বন্ধু সঙ্গে গেলে তার খাওয়া যদি কম হয় – এই ভয়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

ভজন প্রসাদ ভোজন সাধ সরপুরিয়া আয়েস রাবড়ি ক্ষীর
কদলী ফলার ফজলি আম সবরি কলা

৩. প্রশ্নগুলোর উভর মুখে বলি ও লিখি।

ক. লোকটি কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে?

খ. এ কবিতায় কী কী খাবারের নাম উল্লেখ আছে?

গ. কোন খাবার সে আয়েস করে থেতে চায়?

ঘ. লোকটি কোন কোন ফল থেতে চায়?

ঙ. সে কোন আম থেতে চাইছে?

চ. ভজন আর ভোজনের মধ্যে পার্থক্য কী?



৪. লোকটি কী কী খাবার থেতে চাইছে তার তাণিকা বানাই।

৫. নেমতন্ত্র সম্পর্কে নিজের কোনো মজার ঘটনা বলি।

৬. আমার প্রিয় খাবারের নাম লিখি এবং কেন প্রিয় তা লিখি।

৭. একই অর্থ হয় এমন শব্দগুলো জেনে নিই।

নেমতন্ত্র – নিমন্ত্রণ, দাওয়াত।

সাধ – ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা।

বিয়ে – বিবাহ, পরিণয়, সাদি।

৮. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. লোকটি আয়েশ করে খেতে চায় |

প্রসাদ ভোজন

খ. লোকটি চাথড়িপোতা যাচ্ছে |

সবরি কলার

গ. শুধু ভজন নয়, সাথে আছে |

রাবড়ি পায়েস

ঘ. লোকটি খেতে চায় |

ভজন শুনতে

ঙ. বাঃ কী ফলার |

ছানার পোলাও

৯. ছড়াটি আবৃত্তি করি।

১০. ছড়াটি পড়ি ও ঠিকমতো বিরামচিহ্ন বসিয়ে লিখি।



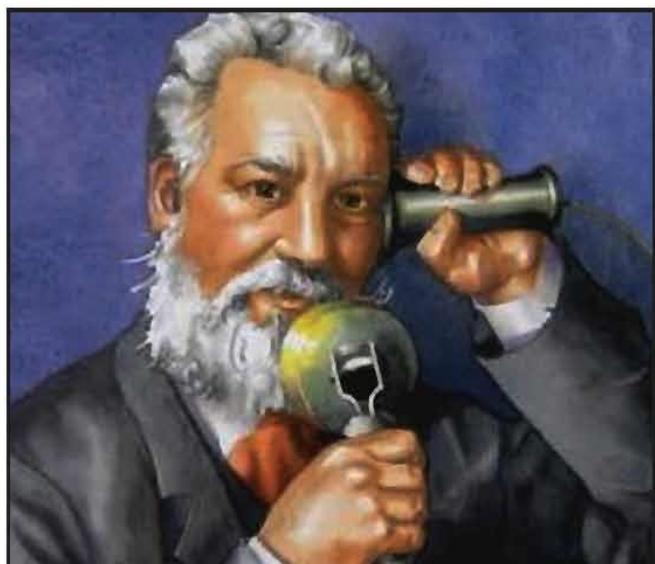
অনন্দাশঙ্কর রায়

কবি-পরিচিতি

অনন্দাশঙ্কর রায় ১৯০৫ সালের ১৫ই মে ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের টেকানল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে ১৯২৬ সালে তিনি প্রশিক্ষণের জন্য বিলাত যান। তিনি একজন বিখ্যাত ছড়াকার। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী এবং উপন্যাসও লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ‘পথে প্রবাসে’, ‘বিনুর বই’, ‘উড়কি ধানের মুড়কি’, ‘রাঙ্গা ধানের খৈ’ প্রভৃতি। অনন্দাশঙ্কর রায় ২০০২ সালের ২৮শে অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

মোবাইল ফোন

আজক্ষের দিনে মোবাইল ফোন চেনে না বা দেখে নি – এমন কাউকে বোধ হয় পাওয়া যাবে না। আমাদের শুরুজনদের কারো কারো মোবাইল ফোন আছে। কিন্তু যাদের নেই তাদের অনেকেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে জানে – কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম। মোবাইল ফোন দিয়ে যে কতো কিছু করা যায় তার সবটা অবশ্য সবাই জানে না। তবে যারা একটু কম জানে তারাও প্রয়োজন মতো তাদের কাজটুকু মোবাইল ফোনে সেরে নিতে পারে। এখন এমন মোবাইল ফোনও আছে যাতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকে, ছবি তোলা যায়, সিনেমা দেখা যায়। এসব মোবাইলে আমরা বই পড়তে পারি, গান শুনতে পারি, এসএমএস পাঠাতে পারি। এমনকি টাকাও পাঠাতে পারি। তুমি তোমার বাসায় বসে মোবাইলে ছবি তুলে সেই ছবি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে পাঠাতে পার।



আলেকজাঞ্জার গ্রাহাম বেল

কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, মোবাইল ফোন আবিষ্কার হলো কেমন করে, অথবা এটা কেমন করে কাজ করে। আসলে মোবাইল ফোন কেউ একজন আবিষ্কার করেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এটার উদ্ভাবন কাজ শুরু হয়। তারপর কালে-কালে একটু একটু করে আজক্ষের মোবাইল ফোন বেরিয়েছে প্রতি বছরই এর পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটছে।

আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। ১৮৭৬ সালের ১০ই মার্চ তিনি তাঁর সহকারী টমাস অগাস্টাস ওয়াটসনের সাথে প্রথমবারের মতো সফল টেলিফোন কল করেন।

প্রথম পর্যায়ে সীমিত আকারে মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয় সেন্ট লুই শহরে ১৯৪৭ সালে। ধাপে ধাপে এর উন্নতি ঘটে। ১৯৬৪ সালের দিকে শুধু গাড়িতে মোবাইল ফোন থাকত। তার ওজন ছিল প্রায় এক কেজি।

১৯৭১ সালে ফিনল্যান্ডে সকল মানুষের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৭২ সালে গবেষক মার্টিন কুপার হাতেধরা ছোট সেট তৈরি করেন।

পাশের ঘরে ফোন করা থেকে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই এখন ফোন দিয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটি কীভাবে ঘটে?

যে এলাকা জুড়ে মোবাইল ফোন কাজ করবে তার সবচাকে কতগুলো অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশে শক্তিশালী বেতার টাওয়ার (মাস্তুল) বসানো হয়। এই টাওয়ারগুলো একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগের একটা অদৃশ্য জাল (নেটওয়ার্ক) তৈরি করে। মোবাইল সেটের মধ্যে থাকে একটা ‘অ্যান্টেনা’। সারাক্ষণ তরঙ্গের মাধ্যমে সেট টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখে। মনে কর কোনো সেট থেকে বোতাম চেপে অন্য কোনো নম্বরে যোগাযোগ করা হলো তখন সবচেয়ে কাছের টাওয়ারের মাধ্যমে অন্য প্রান্তের মোবাইল সেটকে সেট খুঁজে নেয়। একটাতে না পেলে রিলেরেসের মতো সেট পরপর যতগুলো টাওয়ার দরকার সব পার হয়। মুহূর্তের মধ্যে পৌছে যায় নির্দিষ্ট নম্বরটিতে। হালো বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে তা তরঙ্গে পরিণত হয়। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চলে যায় অন্য প্রান্তে। আবার গ্রাহকের ফোনসেট বেতার তরঙ্গকে কথায় বা আওয়াজে রূপান্তরিত করে। অনেকগুলো জায়গায় বসানো নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে সমন্বয় করে মোবাইল ফোনের পুরো কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

তরঙ্গ উদ্ভাবন গবেষক অধ্যয় অ্যানটেনা রূপান্তরিত এসএমএস সমন্বয়

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গবেষক অ্যানটেনা উদ্ভাবন তরঙ্গ সমন্বয় এসএমএস রূপান্তরিত

ক. মানুষ নিজের কাজের জন্য অনেক কিছু করেছে।

খ. নদীর চোখে দেখা যায়, কিন্তু বেতার তরঙ্গ দেখা যায় না।

গ. সব সময় নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন।

ঘ. রেডিও এবং মোবাইল ফোনের থাকে।

ঙ. পানি ফুটলে বাস্পে হয়।

চ. বাড়ি পৌছে আমাকে পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

ছ. তোমাদের সবাইকে মোবাইল ফোনে কাজের করতে হবে।

৩. নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও শিখ।

ক. মোবাইল ফোন আজকের দিনে কী কী কাজে লাগে?

খ. মোবাইল ফোন উদ্ভাবনের জন্য কারা কারা কাজ করেছেন?

গ. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কীভাবে অন্য জনের সাথে কথা হয়?

ঘ. মোবাইলে কথা বলার জন্য সব জায়গায় কী বসাতে হয়?

ঙ. এসএমএস কী এবং কখন কাজে লাগে?

৪. মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পর্কে শিখি।

৫. ডান দিকের সঙ্গে বাম দিকের শব্দ সাজাই।

পরিবর্তন

বিচ্ছি

গ্রাহাম

ইন্টারনেট

সীমিত

বেতার

শক্তিশালী

মুহূর্তের

সংযোগ

পর্যায়

টাওয়ার

মধ্যে

ধরনের

বেল

তরঙ্গ

উন্নয়ন

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বেশি

কম

শুরু

শেষ

শক্তিশালী

দুর্বল

কাছে

দূরে

ভালো

মন্দ

ক. সময় অল্প তাই বেশি যাওয়া উচিত নয়।

খ. মোবাইল ফোনের টাওয়ারগুলো খুব।

গ. যত লেখাপড়া করবে জীবনে তত ভালো ফল করবে।

ঘ. সবাই তোমার প্রশংসা করবে যদি তুমি কাজ কর।

ঙ. কাজ করে তারপর খেলতে যাব।

৭. সংখ্যাবাচক শব্দ লিখি।

এই লেখায় ‘প্রথম’, ‘দ্বিতীয়’ এরকম শব্দ রয়েছে। এগুলো হলো সংখ্যাবাচক বা ক্রমবাচক বিশেষণ। এভাবে আরও কয়েকটি শব্দ শিখি।

সংখ্যাবাচক বিশেষণ	ক্রমবাচক বিশেষণ
এক	প্রথম
দুই	দ্বিতীয়
তিনি	তৃতীয়
চারি	চতুর্থ
পাঁচ	পঞ্চম
ছয়	ষষ্ঠি
সাত	সপ্তম
আট	অষ্টম
নয়	নবম
দশ	দশম

৮. আমার পরিবার মোবাইল ফোনের সাহায্যে কী কী সুবিধা পারি তা লিখি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে মোবাইল ফোনে কথা বলার অভিনয় করি।

খ. দশটি ক্রমবাচক শব্দ ব্যবহার করে দশটি বাক্য লিখি।

আবোল-তাবোল

সুকুমার রায়

ছুটলে কথা, থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাই ধপাধপ তবলা বাজে-
রাম-খটাখট ঘ্যাচাং ঘ্যাচ
কথায় কাটে কথার পঁচ।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

(সংক্ষেপিত)



অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

আবোল-তাবোল কথা বলার মানে, মনের খেয়ালে কথা বলতে থাকা। আমরা কথা বলি যাতে অন্যে সে-কথা শোনে এবং শুনে কিছু একটা করে। যেমন, যদি বলি – মা, ভাত খাব। মা তখন আমায় ভাত দিতে ছুটবেন! কিন্তু যদি ভূতের মতো নাকি সুরে বলি ‘আউ মাউ খাউ ভাঁতের গন্ধ পাউ’ তখন মা ভাববেন, আমি খেলা করছি। সেটা তখন আবোল-তাবোল কথা হয়ে গেল, যে কথার অর্থ নেই, যে কথা দিয়ে কিছু বোঝাতে চাইছি না।

এটি সে-রকমই একটি ছড়া যা জোরে জোরে পড়লেই শুনতে মজা লাগে। একটা লোক মনের আনন্দে কেবলই বকবক করে কথা বলে চলেছে, ইচ্ছে হলে গানও গাইছে। যতক্ষণ না দুচোখে ঘূম নামল ততক্ষণ সে এমনটাই করে গেল।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঠেকায় তবলা ধ্যাচাঁ ধ্যাচ পঁয়াচ ঘূম ঘনিয়ে এলো মনের মাঝে
সাঙ্গা রাম-খটাখট

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে থাক্য তৈরি করি।

ঘনিয়ে এলো সাঙ্গা ধ্যাচাঁ ধ্যাচ ঠেকায় মনের মাঝে পঁয়াচ

ক. তুহিন লেখাপড়ায় এতো ভালো যে ওকে কে?

খ. লোকটি করে গাছের ডালটি কেটে ফেলল।

গ. বসে থাকতে থাকতে তার ঘূম ।

ঘ. দেওয়া কথা বোঝা যায় না।

ঙ. তাড়াতাড়ি খেলাধুলা কর, পড়তে বসতে হবে।

চ. পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় তার আনন্দের টেক্ট
বয়ে যায়।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

- ক. কী ছুটছে যাকে থামানো যাচ্ছে না?
- খ. ধাঁই ধপাধপ আওয়াজে কোথায় তবলা বাজছে?
- গ. কখন গানের পালা সাজা হলো?



৫. ছড়াটিতে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা করি।

৬. ছড়াটি মুখস্থ করি ও বলি।

৭. বই না দেখে ছড়াটি লিখি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

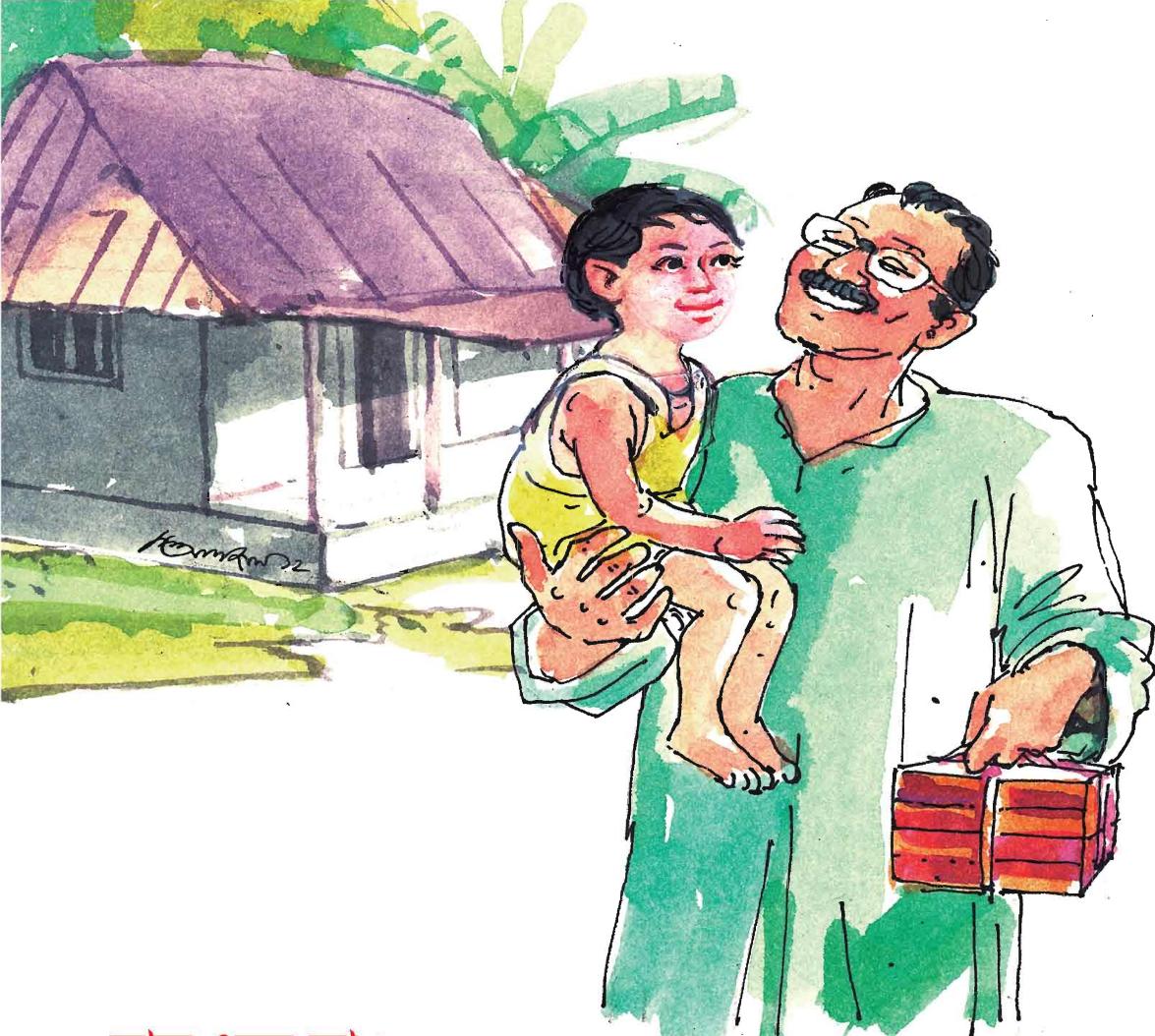
ছড়ার মতো করে দুইটি লাইন লিখি।



সুকুমার রায়

কবি-পরিচিতি

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ৩০ শে অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ‘আবোল-তাবোল’, ‘হ-য-ব-র-ল’, ‘পাগলা দাশু’, ‘বহুরূপী’, ‘খাইখাই’, ‘অবাক জলপান’ তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন। আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত চলচিত্র পরিচালক হলেও শিশু কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।



হাত ধুয়ে নাও

অন্তু খুব হাসিখুশি ছেলে। পড়াশুনায় ভালো অন্তু, খেলাধূলায়ও বেশ। কিন্তু একটু চখ্বল। মামাকে মা জানিয়েছিল, আজকাল অন্তুর শরীরটা সব সময় ভালো যায় না। প্রিয় ভাগিনাকে অনেক দিন দেখেন নি মামা। তাই ছুটি নিয়ে দেখতে এসেছেন।

অন্তু বাইরে খেলা করছিল। মামার আসার কথা শুনে ছুটে চলে আসে ঘরে। ঘরে ঢুকেই সুগন্ধিটা পায় সে। মামার হাতে ওর প্রিয় খাবার বিরিয়ানি। বিরিয়ানি দেখেই মামার দিকে হাত বাড়ায় সে। তর সইছে না তার। প্যাকেট খুলে নিয়েই হাত দিয়ে খাবলে খেতে শুরু করে।

— “কী যে মজা, মামা...!” অন্তুর কথা শেষ না হতেই মামা ওর হাতটি সরিয়ে দেয় খাবার থেকে। বলেন, “অন্তু এভাবে কেউ খায় নাকি?”

অন্তু গাল ফুলিয়ে হাতটাই চেটেপুটে খেতে থাকল। অমনি আবার মামা ওর হাত চেপে ধরলেন।

“অন্তু, এভাবে খায় না।”

ভিতর থেকে মা এসেও অন্তুকে বকাবকি করলেন এভাবে খাওয়ার জন্য।

—“আহ্ বুবু, তুমি আবার বকছ কেন? এটা মামা-ভাগিনার ব্যাপার। আমি দেখছি।”

এবার মামা ওকে খাবার ঘরের পাশে হাত ধূতে নিয়ে গেলেন। সাবান দিয়ে অন্তুর হাত ধূইয়ে দিলেন। বিরিয়ানির প্যাকেটের পাশে বসিয়ে দিয়ে বলেন, “ন্যাও এবার খাও। তোমার জন্যই তো আনা।” খেতে খেতে অন্তুর নাকে সর্দির পানি এসে যায়। ও সেটা বাঁ হাত দিয়ে টিপে সার্টে মুছে নেয়। মামা দেখে আবার চোখ পাকান।

মা বলতে থাকেন, “বুঝলি সান্টু। ছেলেটাকে এত দেখে-শুনে রাখি, তারপরেও দ্যাখ, আজকাল ওর যেন এটা-সেটা অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। ভাবছি ভালো ডাক্তার দেখাব।”

বাবা তাতে যোগ করেন — “সান্টু, তোমার জানা ভালো ডাক্তার কেউ আছেন?”

“আচ্ছা, আমি দুদিন আছি। একটু দেখে নিই। মনে হয়, ওর কোনো বিশেষ অসুখ নয়। ওর দরকার আরও সতর্ক হওয়া।” একটু পরেই দেখা গেল অন্তু টয়লেট থেকে বের হচ্ছে। তারপর সোজা ছুটে চলে গেল বাইরের খেলায়।

সন্ধিয়ায় মামা অন্তুর সঙ্গে কিছু সময় কাটালেন। ওর সারা দিনের চলাফেরা, মুখ-হাত ধোয়া, গোসল করা, খাওয়া-দাওয়া, সব কিছু সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পর দিন বিকেলে অন্তুর সঙ্গে মামা মাঠে গেলেন। ঘরে ফিরে মামা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অন্তুর মুখ-হাত ধোয়ালেন। মা দেখে মুচকি হেসে বলেই ফেললেন—“আমার কথা তো শোনো না বাছা। এখন মামা এসেছে বলে কতো ভালো ছেলে।”

বাবা হেসেই বললেন—“না, অন্তু তো বরাবর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ভালো ছেলে।”

মামা বলেন, “হাঁ, ভালো ছেলে বটে, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কতটা সেটাই তো দেখছি।”

তারপর অন্তুকে বাবা-মার সামনে বসিয়ে মামা বললেন—“আমি সব দেখলাম ভাগিনা। তোমার একটা অভ্যাস ভালো করতে হবে। আর তা হচ্ছে হাত ধোয়া। তুমি ঠিকমতো হাত ধোও না, হাত পরিষ্কার কর না। বিশেষ করে খাওয়ার আগে ও পরে আর টয়লেট থেকে এসে। নাকের সর্দিও যেমন-তেমন করে মোছ। তারপর হাতও দেখলাম ধোও না। এগুলো মোটেই ভালো নয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রথম কাজই হলো ঠিক মতো হাত ধোয়া। তোমার নখগুলো পরিষ্কার নয়। রোগবালাইয়ের শুরু কিন্তু এখান থেকেই।

“দ্যাখো মামা, আমার হাত তো...পরিষ্কার দেখাচ্ছে না?” অন্তু বলার চেষ্টা করে।

মামা বললেন –“পরিষ্কার দেখাগেই হাত আসলে পরিষ্কার হয় না। আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু ধরি, অনেকের সাথে হাত মেলাই। এই সব কিছুতেই জীবাণু থাকতে পারে যা হাতে লেগে যায়। খাওয়ার আগে অথবা টয়লেট করার পর সাবান দিয়ে হাত না ধুলে এমনটা হয়। এই রকম জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। তাই ভালো করে হাতধোয়া না হলে ওই সব জীবাণু খাবারের সঙ্গে আমাদের পেটে চলে যায়। আর বেশিরভাগ পেটের রোগ, সর্দি-জ্বর ওই সব জীবাণু থেকেই হয়। কাজেই অন্যকিছু খাওয়ার আগে দু হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধূয়ে নিতে হবে।”

এটা একটা অভ্যাস। ভালো করে হাত ধোয়ার অভ্যাস করলেই দেখবে তোমার অসুখ-বিসুখ কমে গেছে।”

অন্তুর বাবা বলেন –“আমিও তো অন্তুকে বলি। যখন বলি তখন করে। কিন্তু সব সময় কি করে?”

মা বললেন –“শুনলি তো বাবুসোনা! মামার কথাই না হয় শুনলে।”

মামা এবার অনেক আদর করলেন। অন্তু খুশি হলো। মামাকে বলে, এখন থেকেসে খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধূয়ে নিবে।

অন্তু আর যা-ই হোক, মামার কথা ফেলবে না। কারণ সে মামার মতো হতে চায়। ঘুমোতে যাবার আগে অন্তু মামার কাছে কথা দেয়, ঠিকমতো হাত ধোবে, সবাইকে বলবে, “যদি সুস্থ থাকতে চাও তো হাত ধূয়ে নাও।”

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

চম্পল খাবলে খাওয়া চেটেপুটে অসুখ-বিসুখ টয়লেট জীবাণু
ভাগিনা সতক অভ্যাস

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অসুখ-বিসুখ চপ্টল খাবলে খেতে চেটেপুটে রোগ বালাই

ক. চড়ুই পাখি অনেক হয়।

খ. ক্ষুধার্ত লোকটি খাবার পেয়ে থাকল।

গ. মজার আচার পেয়ে সবাই খাচ্ছে।

ঘ. শরীরের যত্ন না নিলে লেগেই থাকবে।

ঙ. থেকে বাঁচার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই।

৩. বাস্তা ভাষায় অনেক রূকমের শব্দ রয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু বিদেশি। এই লেখাটিতে **ট্যালেট, বিরিয়ানি, জরুরি**-এগুলো বিদেশি শব্দ। এরকম আরও শব্দ জেনে নিই এবং তা দিয়ে বাক্য রচনা করি।

রিঞ্জা, সরকারি, আদালত, বেঞ্চ, স্টেডিয়াম, স্টেশন, বাস

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. অন্তু মামার কাছ থেকে কী সম্পর্কে জেনেছিল?

খ. কেন অন্তুর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত?

গ. সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে কী হয়?

ঘ. হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে আর কী করতে হয়?

ঙ. হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু কেমন করে থাকে?

চ. কী অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায়?

ছ. অন্তু মামাকে কী কথা দিয়েছিল?

৫. গোসল করা কেন দরকার—গাঁচটি বাক্যে বলি ও লিখি।



৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

সুগন্ধ	দুর্গন্ধ	আবর্জনার দুর্গন্ধে পরিবেশ নষ্ট হয়।
হাত	পা	বাইরে থেকে এসে হাত-পা ধুয়ে নিতে।
প্রিয়		
বকা		
হিসাব		
সোজা		

৭. কর্ম-অনুশীলন।

- ক. কেন আমরা হাত ধুয়ে থাকি তা বলি।
- খ. শ্রেণিকক্ষে হাত ধোয়ার অভিনয় করে দেখাই।



মোদের বাংলা ভাষা

সুফিয়া কামাল

মোদের দেশের সরল মানুষ
 কামার কুমার জেলে চাষা
 তাদের তরে সহজ হবে
 মোদের বাংলা ভাষা।

বিদেশ হতে বিজাতীয়
 নানান কথার ছড়াছড়ি
 আর কতকাল দেশের মানুষ
 থাকবে বল সহ্য করি।

যারা আছেন সামনে আজও
 গুণী, জ্ঞানী, মনীষীরা
 আমার দেশের সব মানুষের
 এই বেদন বুঝুন তারা।

ভাষার তরে প্রাণ দিল যে
 কত মায়ের কোলের ছেলে

তাদের রক্ত-পিছল পথে
 এবার যেন মুক্তি মেলে।
 সহজ সরল বাংলা ভাষা
 সব মানুষের মিটাক আশা।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ঠাকুরদা-ঠাকুমা সকলেই বাংলায় কথা বলেন। দেশের সব মানুষই বাংলায় কথা বলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করেছিল, হরতাল করেছিল। তখন তাঁদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ছাত্রসহ অনেকেই মারা যায়। মাতৃভাষার চেয়ে প্রিয় আর কোনো ভাষা হতে পারে না। বাংলাদেশের সব মানুষের ইচ্ছা, আশা ও আকাঞ্চ্ছা মাতৃভাষাতেই ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়। বাংলায় কথা বলার সময় বিদেশি ভাষা ব্যবহার না করা ভালো।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

কামার কুমার সহ্য করা জ্ঞানী মনীষী রক্ত-পিছল মুক্তি বিজাতীয়
বেদন মিটাক

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে ‘কামার কুমার জেলে চাষা’ কোন ভাষাতে কথা বলেন?

খ. এ দেশের মানুষের ‘বেদন’ কী?

গ. কী সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে?

ঘ. তাদের কোন মুক্তির কথা বলা হয়েছে?

ঙ. বাংলা ভাষাকে সহজ সরল ভাষা বলা হয়েছে কেন?

৪. কবিতাটি পড়ে কী বুঝাম তা সংক্ষেপে লিখি।

৫. কবিতার প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলি।

৬. কবিতার প্রথম আট লাইন বই না দেখে ঠিকভাবে লিখি।



৭. আমার প্রিয় মাতৃভাষা নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৮. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. লোহা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন |

জ্ঞানী

খ. মাটি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন |

কামার

গ. যাঁর অনেক জ্ঞান আছে তিনি হলেন |

রক্ত-পিছল পথ

ঘ. রক্ত দিয়ে পিছল হয়েছে যে পথ তা হলো |

কুমার

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলা ভাষার ওপর লিখিত অন্য কোনো কবিতা বা ছড়া শিখি ও আবৃত্তি করি।

খ. শিক্ষকের সাহায্যে বাংলা ভাষা বিষয়ক স্বরণীয় বাণী পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে প্রদর্শন করি।

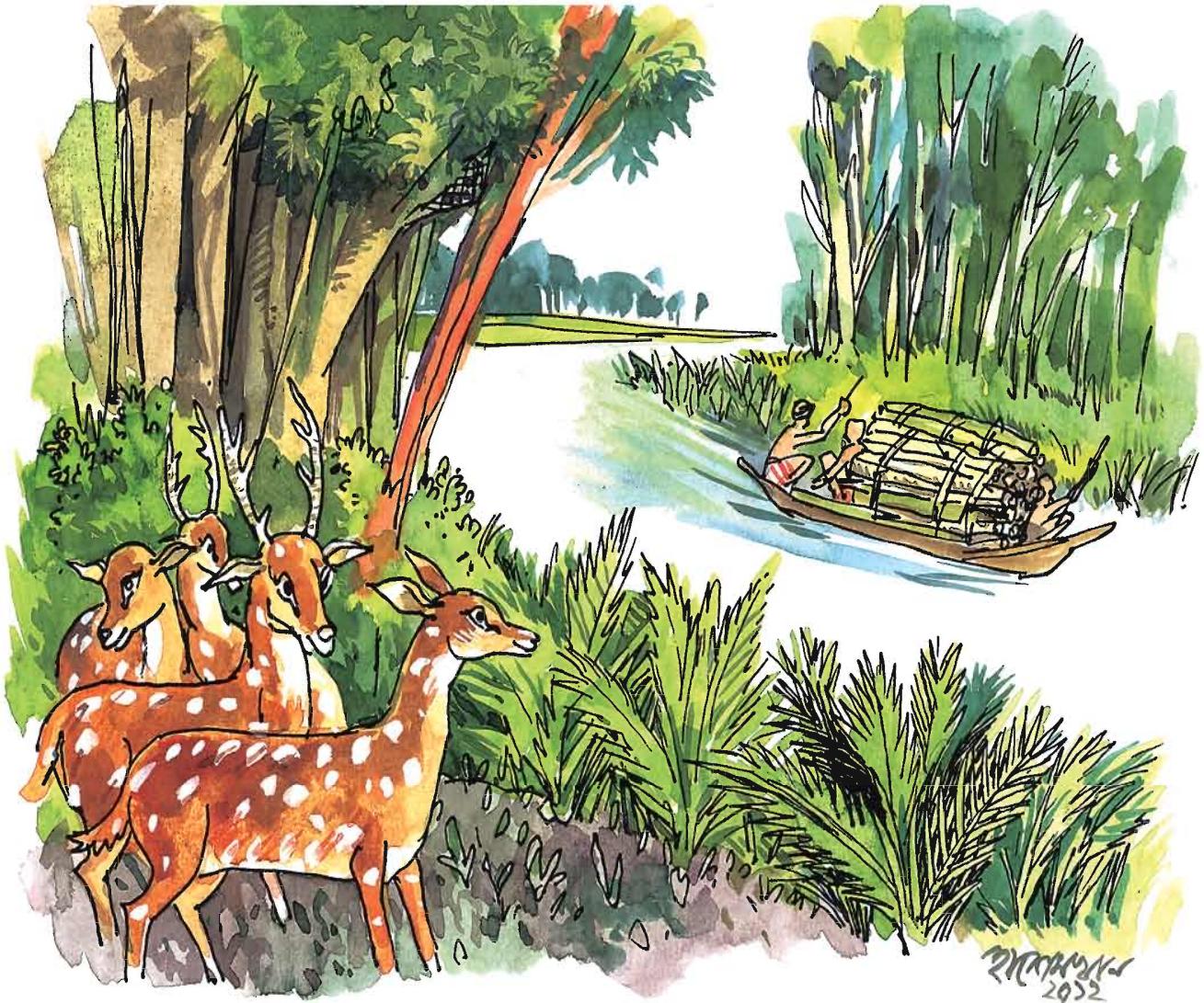
কবি-পরিচিতি



কবি বেগম সুফিয়া কামাল ২০শে জুন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ও সমাজসেবী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘সাঁওরের মায়া’, ‘মায়াকানন’, ‘ইতল বিতল’, ‘স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ২০শে নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুফিয়া কামাল

বাওয়ালিদের গন্ধ



আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। এর প্রায় পুরোটাই সমতলভূমি। আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবন। এই বনের সব গাছই বঙ্গোপসাগরের নোনা পানিতে বেঁচে আছে। এই বন নানা ধরনের হাজার রকমের পশু ও পাখিতে পূর্ণ। সুন্দরবনের কোনো কোনো জায়গায় গাছপালা এত ঘন যে, সূর্যের আলো মাটিতে পৌছায় না।

সুন্দরবনের তিনপাশে ছড়িয়ে আছে অনেক গ্রাম। গ্রামের মানুষ কৃষিকাজ করেন। গ্রামের অনেক মানুষ বন থেকে গোলপাতা ও মধু সংগ্রহ করে। মৌমাছিরা গাছে গাছে তাদের মৌচাক বানায়। যারা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেন, তাদের বলে মৌয়াল।

সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের হাজার হাজার পাই আছে। এই সব গাছ উপকূলীয় এলাকার জন্য প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। এইজন্য ১৯৮৯ সাল থেকে সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে। তবে সরকারের অনুমতি নিয়ে সুন্দরবন থেকে পোলপাড়া সঞ্চাহ করা যায়। যারা এ কাজ করেন তাদেরকে বলা হয় বাওদালী। বাওদালীদের কাজ খুবই কষ্টের। শুধু তাই নয়, এই বনে আছে অনেক তরক্কির পাণী, যেমন বাঘ। বাঘ মালোলী পাণী। সে অন্য পাণী থেকে বাঁচে। যেমন: হরিণ, বুনো শুয়োর, বানর ইত্যাদি। বাঘ মানুষকেও আক্রমণ করে। তাই সুন্দরবনে বাধৈ মানুষের সবচেয়ে তরের বিষয়। ভাষ্টোড়াও এই বনে বনবিড়াল, বুনোশুয়োর, বানর, সাপ আছে। আর পানিতে আছে ঘাছ কুমিল ও হাঙ্গর।



বাওয়ালি আর মৌয়ালিরা সুন্দরবন থেকে অনেক দূরের গ্রামে থাকেন। রোজ রোজ বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাহলে কোথাও তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। রাতের বেলায় হিন্দু জন্মের তাদের আক্রমণ করতে পারে। তাই তারা নদীর মাঝখানে নৌকার মধ্যে রাত কাটান।

বাওয়ালিদের অন্য বিপদও আছে। সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে লবণাক্ত পানির নদী আর ছোট খাল বয়ে চলেছে। মানুষ লবণাক্ত পানি থেতে পারে না। সেইজন্য বাওয়ালিরা তাদের সাথে পানির ছোট ছোট পাত্র রাখে। তারা এই পানি খুবই সাধানে ব্যবহার করেন। একটুও অপচয় করেন না। পানি শেষ হয়ে গেলে সহজেই খাওয়ার পানি পাওয়া যাবে না সুন্দরবনে। সেজন্য সুন্দরবন থেকে নানাকিছু সংগ্রহ করার জন্য যারা বনে যান তাদের সাধানতা অবলম্বন করতে হয়।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

জন্মভূমি সমতলভূমি কৃষিকাজ চাষাবাদ সংগ্রহ করা পরিশ্রম হিন্দু
মাংসাশী সতর্ক লবণাক্ত

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রথমে বলি ও পরে লিখি।

ক. সুন্দরবন বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

খ. সুন্দরবনের গাছপালা কোথা থেকে পানি পায়?

গ. বাওয়ালি কারা?

ঘ. বাওয়ালিদের কাজ এত বিপদজনক কেন?

ঙ. কীভাবে মানুষ এই বন থেকে অর্থ আয় করে, দুটো উপায় বলি।

চ. সুন্দরবনে কাজ করার সময় কোনটি বাওয়ালিদের কাছে বেশি মূল্যবান, খাবার না খাবার পানি? কেন?

ছ. বাওয়ালিরা কোথায় রাত কাটান?

জ. সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে কেন?

ঝ. মৌয়াল ও বাওয়ালিদের কাজ বর্ণনা করি।

৩. খাতায় লিখে ছকটি পূরণ করি।

(একটি ছক বা টেবিল তৈরি
করে শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে।)



পেশার নাম	কাজ	কাজের স্থান	এই কাজের কতটা বিপদ	এই বিপদে চলার জন্য কী কী সমাধান আছে
বাওয়ালি				
মৌয়াল				

৪. নিজের জানা যেকোনো কাজ নিয়ে ছকটি পূরণ করি।

(একটি ছক বা টেবিল তৈরি করে শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে।)

পেশার নাম	কাজ	কাজের স্থান	এই কাজের কতটা বিপদ	এই বিপদে চলার জন্য কী কী সমাধান আছে

৫. উপরের ছকের তথ্য ব্যবহার করে কাজটি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

৬. ছবির নিচে পেশার নাম লিখি এবং পেশাটি সম্পর্কে একটি করে বাক্য তৈরি করি।



.....
.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....
.....

পাখির জগৎ



পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল ।

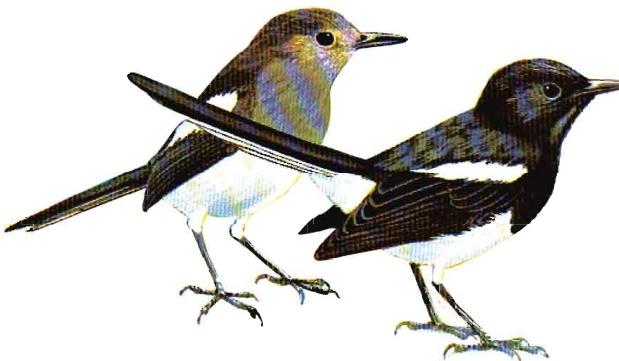
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল ।

কবিতার কথাগুলো সাম্যকে ভাসিয়ে তুলল । তাই তো, ভোর হলেই পাখি ডেকে ওঠে । ঘুম
ভেঙ্গে যায় । পাখিরা যেন তোরের দৃত । চড়ুই শালিক এরকম দুয়েকটা পাখি সাম্য দেখেছে ।
কিন্তু আরও যে নানা ধরনের পাখি আছে, সে সব পাখির কথা জানতে ইচ্ছে করে তার ।
মাকে সে জিজেস করবে পাখিদের কথা ।

আচ্ছা মা, পাখিরা কি রাতে ঘুমায় না? ভোর না হতেই কিচিরমিচির করা শুরু করে দেয়। মা বলেন, তা হবে কেন। পাখিরাও ঘুমায়। মা বলেন, পাখির দেশ, নদীর দেশ বাংলাদেশ। পাখিরা প্রকৃতির শোভা। গাছে গাছে ঝোপে ঝাড়ে নদীতীরে তাদের বিচরণ। কখনো তারা দল বেঁধে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কখনো পাতার ফাঁকে চুপ করে বসে থাকে। কখনো খাবারের খোজে পোকামাকড়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে।

মা আরও বললেন, দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। এদের গায়ের রং সাদা-কালো। এরা থাকে লোকালয়ে আর অগভীর জঙ্গলে। গাছের উঁচু ডালে মাঝে মাঝে মধুর সুরে গান গায়। ছোট ডাল, খড়কুটো ও শিকড় বাকড় দিয়ে বাসা বানায়। নানা ফুলের মধু আর কীটপতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য।

ছোট পাখি চড়ুই। চড়ুই আমাদের ঘরেরই কেউ। লোকালয় এদের প্রিয় জায়গা। বাসাবাড়ির ঘূলঘূলিতে খড়, টুকরো কাপড়, শুকনো ঘাস দিয়ে এরা বাসা তৈরি করে। মাথা ছাই রঙের। পিঠে বাদামি পালক। তার উপরে কালো ছোট দাগ। ডানার উপরে সাদা অথবা লালচে রেখা। এরা কীটপতঙ্গ খেয়ে ফসলের শত্রু নাশ করে। শস্যদানা এদের প্রিয় খাদ্য।



দোয়েল



চড়ুই

ছোট আরেক পাখি টুনটুনি। পালকের রং জলপাই সবুজ। মাথায় লালচে রঙের ছোপ। লম্বা ঠোঁটের রং কালচে খয়েরি। পায়ের রং হলুদাভ। লেজ নাড়িয়ে টুই টুই শব্দ করে উড়ে বেড়ায়। এরা মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। চমৎকার বাসা বানায়। পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে। ফুলের মধুই টুনটুনির সবচেয়ে প্রিয়।



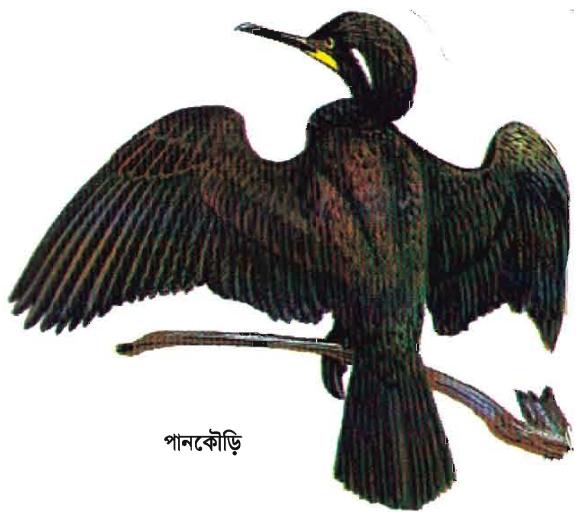
চুম্বনি



আবাবিল



বুলবুল



পানকৌড়ি

চড়ুইয়ের মতো চথল স্বভাবের আরেকটি পাখি হলো বুলবুলি। বুলবুলির মাথা ও গলা কালো। মাথার উপর রাজকীয় কালো ঝুঁটি। এর তলপেট সাদা। তলপেটের শেষে লাল ছোপ। এরা খুব দ্রুত উড়তে পারে।

পানির সঙ্গে যার সখ্য, সেই পাখিটির নাম পানকৌড়ি। পুকুর, খাল ও বিল এদের বিচরণস্থল। কুচকুচে কালো এই পাখি ডুব দিয়ে তিন মিটার পর্যন্ত সাঁতরাতে পারে। এদের পায়ের পাতা ঝাঁঁসের মতো। ঠোঁট তীক্ষ্ণ আর বাঁকানো। এরা জলজ কীটপতঙ্গ খেতে ভালোবাসে।



বাঁশপাতি



শালিক

বাংলাদেশে আরও অনেক পাখি আছে। এই পাখিগুলো হলো খঞ্জনা, ডাহুক, কোকিল, বাঁশপাতি, শ্যামা, ধনেশ, পানডুবি, ফিঙে, টিয়া, বাবুই ইত্যাদি। মা বলেন, পাখিরা মানুষের বন্ধু। এরা অনেক উপকারী। কিছু কিছু পাখি পরিবেশকে সুন্দর রাখে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে ঝুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বিচরণ চমৎকার পরিবেশ ঝুঁটি নাশ দৃত লোকালয় স্থ্য

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

উপকারী লোকালয়ে পরিবেশ কীটপতঙ্গ

ক. নানা ফুলের মধু ও পাখিদের প্রিয় খাবার।

খ. চড়ুই পাখি থাকতেই বেশি পছন্দ করে।

গ. আমাদের রক্ষার প্রতি সচেতন হওয়া উচিত।

ঘ. পাখিরা মানুষের বন্ধু, এরা অনেক।

৩. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও শিখি।

আনন্দ	ন্দ	ন	দ	মন্দ, ছন্দ
জিজ্ঞেস	জ্ঞ	জ	ঞ	আজ্ঞা, বিজ্ঞ
জঙ্গল	ঞা	ঙ	গ	মঙ্গল, রঞ্জা
লম্বা	ম্ব	ম	ব	সম্বল, কম্বল

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. চড়ুই পাখির প্রিয় জায়গা –

- ১. বন
- ২. লোকালয়
- ৩. স্কুলঘর
- ৪. আস্তাবল

খ. পানকৌড়ি খেতে ভালোবাসে –

- ১. মাছ
- ২. মাংস
- ৩. কীটপতঙ্গ
- ৪. গাছের পাতা

গ. পাখিরা পরিবেশকে –

- ১. নষ্ট করে
- ২. দূষণ করে
- ৩. সবুজ রাখে
- ৪. সুন্দর রাখে

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও শিখি।

- ক. পাখিদের ভোরের দৃত বলা হয়েছে কেন?
- খ. জাতীয় পাখি দোয়েলের বৈশিষ্ট্য কেমন?
- গ. কোন পাখি আমাদের ঘরেরই কেউ? কেন?
- ঘ. কোন পাখি পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে? কীভাবে?
- ঙ. বুলুবুলি পাখি দেখতে কেমন?

৬. বাক্য রচনা করি।

জগৎ আটকে গেল ক্লাস শস্যদানা স্বত্বাব

৭. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক ছবিটি মিলাই।

খুব দ্রুত উড়তে পারে



শিকড়বাকড় দিয়ে বাসা বানায়



লেজ নাড়িয়ে টুই টুই শব্দ করে উড়ে বেড়ায়



লোকালয় এদের প্রিয় জায়গা



পানিতে বেশি সময় থাকে



৮. ব্যবহার শিখি।

টি, টা, খানা, খানি, এটি, ওটি, এগুলো, ওগুলো

টি – পাখিটি দেখতে কী সুন্দর!

টা – শেলফের বইটা কার?

খানা – বইখানা দাও।

খানি – মুখখানি তার ভারি মিষ্টি।

এটি – এটি আমার বই।

ওটি – ওটি কার বই?

এগুলো – এগুলো পাখির ছবি।

ওগুলো – ওগুলো ধরো না।

৯. কর্ম অনুশীলন।

আমার দেখা যেকোনো একটি পাখির কথা বর্ণনা করি।



কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
মাগো, আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জুলে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রাই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?

সেদিন হতে দিদিকে আর কেনই-বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?

খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে ডাকি, তখন
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি, — তুমি কেন চুপটি করে থাকো?
বল মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে —
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?
আমিও নাই দিদিও নাই কেমন মজা হবে!

ভুঁইঁচাপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস না তারে উড়িয়ে মা গো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল;
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কী মা বল!

ঝাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে;
নেবুর গম্বুজ ঘূম আসে না— তাইতো জেগে রই;
রাত হলো যে, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

ছেটি বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে, তা সে জানে না, বোঝে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। সে কোথায় গেছে, কেন আসে না তা জানতে চায় মায়ের কাছে। মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে কাঁদেন।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

শোলক জোনাই দিদি নেবু ভুইঁচাপা মাড়াস নে

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই।

দিন	—	রাত
ঘুম	—	জাগরণ
ঢাকা	—	খোলা
নতুন	—	পুরনো
জুলা	—	নেভা

৪. ডান দিক থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিই ও খাতায় লিখি।

ক. কোথায় জোনাকি জুলে?

নেবুর তলে / বাঁশবাগানে/
শিউলিতলে / তাল তলায়

খ. বুলবুলি কোথায় লুকিয়ে থাকে?

শিউলির ডালে / ভুইঁচাপার ডালে/
আমের ডালে / ডালিমের ডালে

গ. কে শোলক বলতেন?

মা / দিদি / দাদু / বাবা

ঘ. ঝিৰ্বি কোথায় ডাকে?

বৌপে-ঝাড়ে / গাছের ডালে/
আঁধার রাতে / ঘরের মাঝে

ঙ. ঘুম আসে না কেন?

নেবুর গন্ধে / ঝিৰ্বির ডাকে/
ঁচাদের আলোতে / ফুলের গন্ধে

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. কাজলা দিদি কোথায় গেছে?
- খ. কখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে?
- গ. কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন?
- ঘ. পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন?
- ঙ. আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে— এ কথা বলে কী বোঝানো হয়েছে?
- চ. খুকি মাকে কেন শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে রয়েছেন?
- ছ. ডালিম গাছের ফল ছিঁড়তে বারণ করেছে কেন?

৬. নিচের শব্দগুলো ঠিকভাবে সাজাই (যেমন— বাঁশবাগান)।

পুতুল	তলে
থোকায়	ধারে
পুকুর	বিয়ে
নেবুর	ঘরে
শোলক	থোকায়
কাজলা	বাগান
বাঁশ	বলা
নতুন	দিদি



৭. কবিতাটি বিরামচিহ্ন দেখে ও ভাব বজায় রেখে পড়ি।



কবি-পরিচিতি

১৮৭৮ সালের ২৭শে নভেম্বর যতীন্দ্রমোহন বাগচী নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিতা রচনা ছাড়াও ‘মানসী’ ও ‘পূর্বাচল’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পল্লিপ্রীতি তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘লেখা’, ‘কেয়া’, ‘বন্ধুর দান’ ইত্যাদি। ‘কাজলা দিদি’ কবিতাটি ‘কাব্যমালখ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পাঠান মুলুকে

সৈয়দ মুজতবা আলী

সর্দারজি চুল বাঁধতে, দাঢ়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন। তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পৌছতে আর মাত্র ঘটাখানেক বাকি। গরমে, ধুলো, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাব-রুটিতে আর স্নানভাবে আমার গায়ে একরণ্তি শক্তি নেই। বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করতেও পারছিলাম না। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ আছে। আমাদের কাছে যেটা কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়।



ইতোমধ্যে গল্পে গল্পে জেনে গেছি পাঠান-মুলুকের প্রবাদ। দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের। গাড়ি পেশাওয়ার পৌছবে রাত নয়টায়। তখন যে কার রাজত্বে পৌছব তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি, এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা-ঠা আলো, নয়টা বাজল কী করে, আর পেশাওয়ারে পৌছুলাম বা কী করে? এখন চেয়ে দেখি সত্য কৃন্যটা বেজেছে।

প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ করলুম, ছয় ফুটি পাঠানের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি এসে উভম উর্দ্ধতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে একহাত এগিয়ে দিলাম। তিনি তাঁর দুহাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ পরম উৎসাহে, গরম সংবর্ধনায়! হঠাৎ আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানি কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু পশ্তুতে মিলিয়ে অনেক কথা বলছিলেন। তার অনুবাদ –“তালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি তো?” আমি ‘জি হাঁ, জি না’ করেই যাচ্ছি। আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদবকায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতাম। খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না। আমি বাঙালি তিনি পাঠান। তবে যে এত সংবর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ঢেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না। আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয় তাহলে তো আর কথাই নেই।

টাঙ্গা তো চলছে পাঠানি কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয় – গাড়ি সোজা চলে। পাঠানমূলুকে লোকজন যার যে রকম খুশি চলে। গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চিৎকার বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে স্বাধীন, রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার স্বাধীনতা রইল কোথায়? কিন্তু ওই স্বাধীনতার দাম দিতেও সে কসুর করে না। ধরা যাক, ঘোড়ার নালের চাট লেগে তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে গেল এতে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিশে ডাকাডাকি করে না। পরম শ্রদ্ধায় ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, দেখতে পাস না? গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান – ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, ‘তোর চোখ নেই?’ ব্যস্ত। যে যার পথে চলল।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে ঝুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ম্লানাভাবে একরণি হোল্ডল ঠা-ঠা আলো আলিঙ্গন করা পশ্তু অভ্যর্থনা
নির্জলা বৃথা খাস ঘোড়ার নালের চাট অবজ্ঞা টাঙ্গা কসুর প্ল্যাটফরম

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বৃথা আলিঙ্গন অভ্যর্থনা একরণি ঠা-ঠা আলো

ক. আমার চোখে ঘূম নেই।

খ. এত চোখ মেলে তাকানো যায় না।

গ. ইদের সময় আমরা সবাই করে থাকি।

ঘ. তাদের অনেক ভালো ছিল।

ঙ. সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সর্দারজিকে চেনা যায় কী দেখে?

খ. দিনের বেলায় ও রাত্রে পেশাওয়ার শহরে কী হয়?

গ. পাঠানদের অভ্যর্থনা কেমন হয়ে থাকে এবং কেন?

ঘ. পাঠানেরা কীভাবে টাঙ্গা চালায়?

৪. ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন – মূল ক্রিয়াপদ – যাওয়া। এই ক্রিয়াপদটি থেকে
অনেক শব্দ হতে পারে। যেমন-

যাই – আমি বাড়ি যাই।

যাব – আমি বিকেলে খেলা দেখতে যাব।

গিয়েছি – আমি ওখানে গতকালও গিয়েছি।

যেতাম – ছোটবেলায় আমি প্রায়ই মামাৰাড়ি যেতাম।

এখন নিচের ক্রিয়াপদগুলো দিয়ে একইরকম ভাবে শব্দ ও বাক্য লিখি।
আসা, খাওয়া, করা

৫. বাক্য রচনা করি ।

ভ্রমণ পেশাওয়ার ঠা-ঠা আলো সংবর্ধনা ডাকাতাকি অবজ্ঞা

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি ।

আরম্ভ	শেষ	আজ আমার পরীক্ষা শেষ হলো ।
গ্রহণ	ঠাণ্ডা	শীতকালে প্রচুর ঠাণ্ডা লাগে ।
কঠিন
ভিতর
দিন
দাঁড়ানো
আলো
উচু

৭. কর্ম-অনুশীলন ।

নিজে বেড়িয়ে এসেছি এরকম একটা জায়গা সম্পর্কে বলি ।



সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখক-পরিচিতি

১৯০৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর সৈয়দ মুজতবা আলী আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বভারতী থেকে মাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগের অধীনে কাবুল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাবুল প্রবাসের বিচ্ছ্র অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে তাঁর ‘দেশে বিদেশে’ গ্রন্থে। ১৯৭৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মা

কাজী নজরুল ইসলাম

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই।

হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কতো না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

যখন জন্ম নিনু
কতো অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোনো কিছু,
ওঠা বসা দূরে থাক—
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা-র পিছু পিছু!





পাঠশালা হতে যবে
 ঘরে ফিরি যাব সবে,
 কতো না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
 খবার ধরিয়া মুখে
 শুধাবেন কত সুখে
 ‘কতো আজ লেখা হলো, পড়া কতো পাতা?’
 পড়া লেখা ভালো হলে
 দেখেছ সে কতো ছলে
 ঘরে ঘরে মা আমার কতো নাম করে!
 বলে, ‘মোর খোকামণি।
 হীরা—মানিকের খনি,
 এমনটি নাই কারো!’ শুনে বুক ভরে!
 দিবানিশি ভাবনা
 কিসে ক্লেশ পাব না,
 কিসে সে মানুষ হব, বড় হব কিসে;
 বুক ভরে ওঠে মা—র
 ছেলেরি গরবে তাঁর
 সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

আমাদের সবার জীবনে ‘মা’ কথাটি একটি মধুমাখা নাম। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন করেন। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে, জীবনে সফল হলে মা খুশি হন। অন্যদিকে মায়ের আশিস পেলে সন্তানের দুঃখ ঘুচে যায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

মতন সুধা হেরিলে পরান যাতনা নিনু ছিনু বাক শুধাবেন সোহাগ
পাঠশালা খনি ক্লেশ আশিস

৩. কবিতার চরণ দেওয়া আছে, পরবর্তী চরণ লিখি।

হেরিলে মায়ের মুখ,

.....

মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,

.....

সকল যাতনা ভোলে

.....

৪. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৫. কবিতার প্রথম বারোটি চরণ মুখস্থ লিখি।

৬. কবিতাটিতে কবি কী বলেছেন তা সংক্ষেপে বলি ও লিখি।

৭. আমার ‘মা’ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

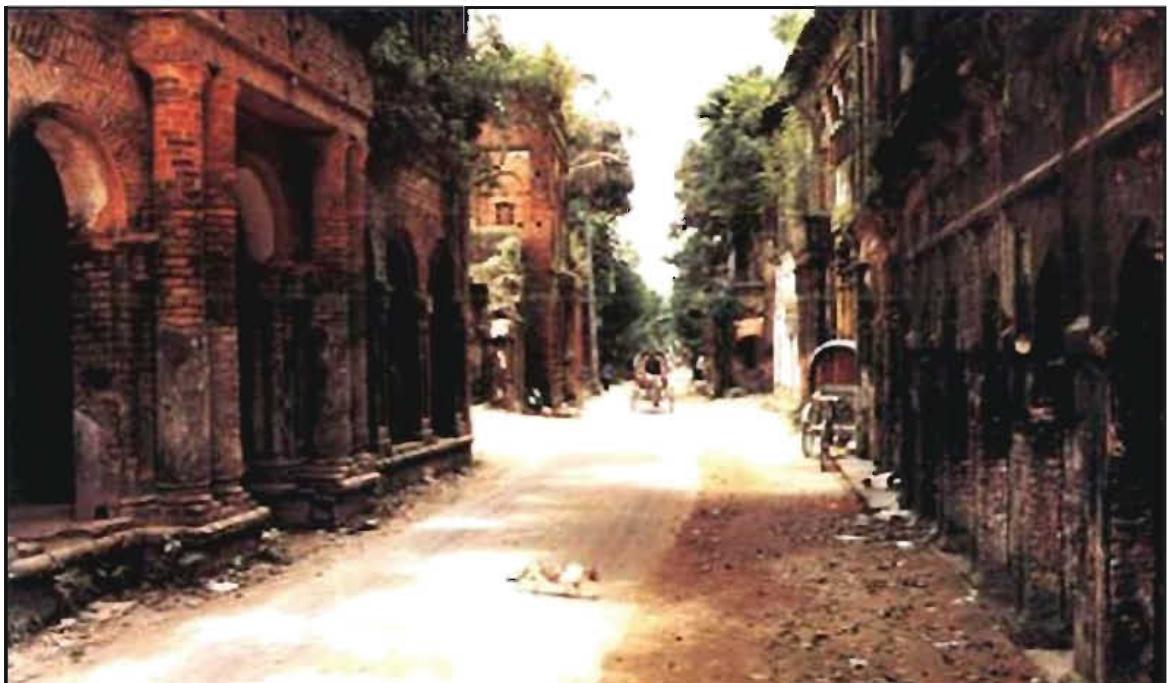


কবি পরিচিতি

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সুরস্রষ্টা, গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী। তিনি ‘নবযুগ’ ও ‘ধূমকেতু’ সহ আরও অনেক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ‘মা’ কবিতাটি ‘বিঞ্চেফুল’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কাজী নজরুল
ইসলাম

ঘুরে আসি সোনারগাঁও



পানাম নগর, সোনারগাঁও

জানুয়ারির মাঝামাঝি। শীতের সকাল। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সূর্য কেবল উকি দিচ্ছে আকাশে। এর মধ্যে সবাই পৌছে গেছে স্কুলে। সাবিহা, নমিতা, কবির, সুবীর সবাই। হাসান স্যার তো আগেই এসে গেছেন।

সবাই যাবে শিক্ষা সফরে। ঐতিহাসিক সোনারগাঁও যাবে তারা। কী আনন্দ, কী উল্লাস সবার মনে।

সাবিহা ভাবছিল সোনারগাঁও আসলে দেখতে কেমন? এটা কি সোনা দিয়ে মোড়া কোনো গ্রাম? হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। হাসান স্যার সবাইকে বাসে ওঠার জন্য তাড়া দিলেন। সবাই সুশৃঙ্খল হয়ে বাসে বসল। হাসান স্যার এবার ঢাকার একটি ম্যাপ ঝুলিয়ে দেখালেন, বললেন—“এই দেখ, সোনারগাঁও। ঢাকা থেকে সোনারগাঁর দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার। এটা নারায়ণগঞ্জ জেলায়। ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বে এ প্রাচীন নগরী সোনারগাঁওয়ের অবস্থান।”

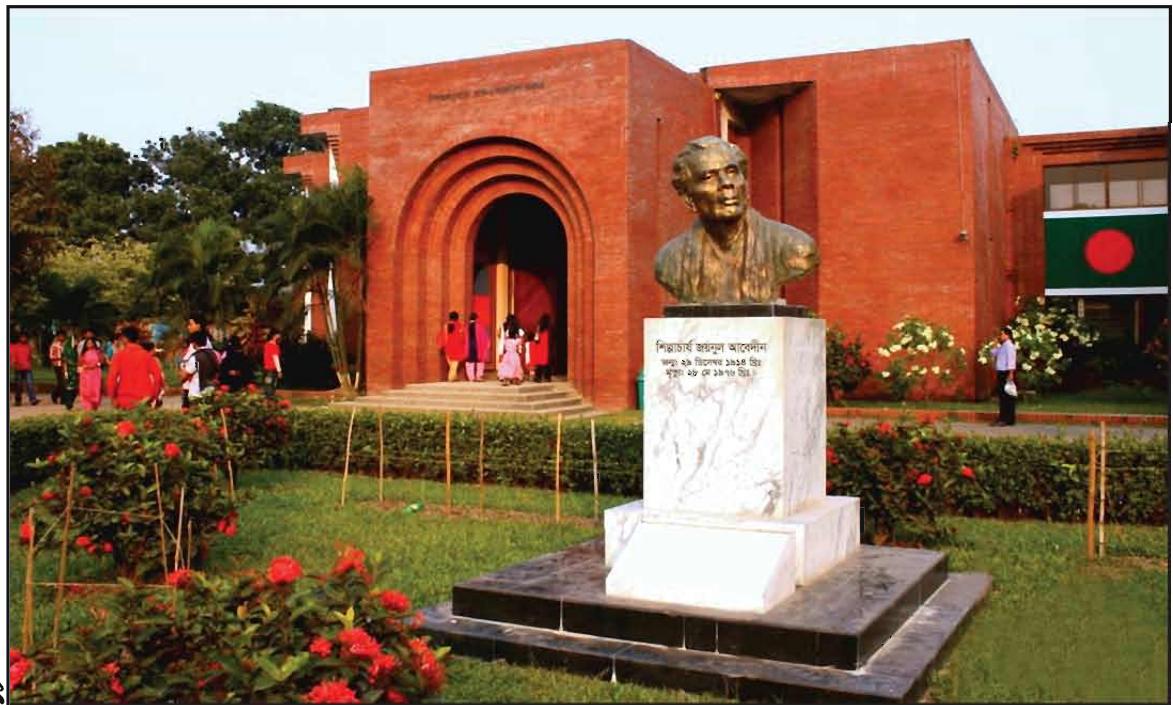
সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল হাসান স্যারের কথা। তিনি জানালেন, “আমরা গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি ফেলে এসেছি। এবার আমাদের বাস চলছে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক পথে। কাচপুর ব্রিজ পার হয়ে একটু গেলেই সোনারগাঁও।”

দেখতে দেখতে বাস এসে পৌছাল সোনারগাঁও। সোনারগাঁওয়ের মাটিতে পা দিয়েই সাবিহার মন খুশিতে ভরে উঠলো। চারদিকে সবুজ গাছপালা আর শীতের সকালের মিষ্টি রোদুর। প্রথমেই তাদের চোখে পড়ল একগম্বুজ বিশিষ্ট একটা প্রাচীন মসজিদ। স্যার বললেন, এটা হচ্ছে গোয়ালদি মসজিদ। মোঘল স্থাপত্য-শৈলীর অপূর্ব নির্দশন রয়েছে এ মসজিদে। তবে এটা তৈরি হয়েছিল মোঘলরা বঙাদেশে আসারও আগে।

হাসান স্যার আরও জানালেন, প্রাচীনকালের সমৃদ্ধ নগর সুবর্ণগ্রাম। পরে এর নাম হয় সোনারগাঁও। ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী। ইশা খাঁ ছিলেন এই অঞ্চলের শাসক।

সোনারগাঁওয়ের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা পানাম নগর। এ যেন নগরের মধ্যে আরেক নগর! সাবিহার ভাবতে আর বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছে।

এর একটা মাত্র রাস্তা। তার দুই পাশে সারি সারি প্রাচীন দালান। দালানগুলো খুব উঁচু নয়। সবই দোতলা। প্রায় একশো বছরেরও আগের তৈরি। এখানেই ধনী ব্যবসায়ীরা বসবাস করতেন। সোনারগাঁও তখন ছিল মসলিন কাপড় তৈরির প্রসিদ্ধ স্থান। সোনারগাঁওয়ে তৈরি মসলিনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও কদর ছিল। পরে সুতি কাপড়ের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে এটি। কিন্তু এদেশে ইংরেজরা আসার পর দেশি কাপড়ের কদর যায় করে।



তখন বিলিতি কাপড় আসা শুরু করে এদেশে। বন্ধ হয়ে যায় এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য। এ শহরের পুরনো দালান বাংলার অভূতপূর্ব স্থাপত্যশৈলী। আমাদের সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে যেন সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমাদের শেষ গন্তব্য সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর দেখার পালা।

একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের যাবতীয় নিদর্শন জাদুঘরেই সংরক্ষিত থাকে। সোনারগাঁওয়ের জাদুঘরে ঢুকতে ঢুকতে সবুজের স্লিপ্ড স্পর্শে সাবিহার মনটা ভরে গেল। কী চমৎকার একটা লেক, শান্ত পুরুর আর গাছগাছালিতে ভরা চারপাশ।

প্রথমেই সবাই ঢুকে পড়ল লোকশিল্প জাদুঘরে। জাদুঘরটা সাধারণ জাদুঘর নয়, লোকশিল্পের জাদুঘর। আমাদের গ্রামীণ মানুষের তৈরি জিনিসপত্রকে বলে লোকশিল্প। হাসান স্যারই কথাটা বুঝিয়ে দিলেন। যে বাড়িতে জাদুঘরটা করা হয়েছে তার আদি নাম বড় সর্দারবাড়ি। দারুণ কারুকাজ করা এর প্রবেশপথ। কত্তো জিনিস যে আছে দেখবার, শিখবার। কাঠের তৈরি জিনিস, মুখোশ, মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, বাঁশ-লোহা-কাঁসার তৈরি নানা জিনিস, অলংকার ইত্যাদি দেখে সবাই বিস্তৃত। কী সুন্দর জামদানি শাড়ি আর কী বাহার ওই নকশি কাঁথার।

সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী জয়নুল আবেদিন। তাঁর সংগ্রহশালায় গিয়ে আরও মুগ্ধ সবাই। তিনি ছিলেন অনেক বড় শিল্পী।



শখের ঈড়ি

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। এবার ঐতিহাসিক সোনারগাঁও থেকে আমাদের ফেরার পালা। বাসের জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের ছবি দেখতে দেখতে ফিরে এলাম ঢাকা। এ স্মৃতি আমাদের মনে গাঁথা থাকবে অনেক দিন।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঐতিহাসিক গম্বুজ বঙাদেশ স্থাপত্য নির্দেশন শাসনকর্তা অঞ্চল সমূক্ষ প্রসিদ্ধ মসজিদ বিলিতি অভূতপূর্ব অস্তগামী স্মৃতি লোকশিল্প বিশিত বাহার ম্যাপ কদর খ্যাত

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. সোনারগাঁও কোথায় অবস্থিত?
- খ. গোয়ালদি মসজিদ কী জন্যে বিখ্যাত?
- গ. পানাম নগর কী জন্য প্রসিদ্ধ?
- ঘ. লোকশিল্প কাকে বলে?
- ঙ. লোকশিল্প জাদুঘর কেন দরকার?
- চ. জাদুঘর বলতে কী বুঝি?
- ছ. সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) ঠিক দিই।

ক. ঘুরে আসি সোনারগাঁও গল্লে শিক্ষা সফরে সবাই কোথায় যাচ্ছিল –

- | | |
|----------------|--------------|
| ১. যাত্রাবাড়ি | ২. সোনারগাঁও |
| ৩. পাহাড়পুর | ৪. চট্টগ্রাম |

খ. লোকশিল্প জাদুঘরের প্রবেশ পথটি কেমন –

- | | |
|----------------------|-----------|
| ১. দারুণ কারুকাজ করা | ২. সাধারণ |
| ৩. অনেক পুরানো | ৪. নতুন |

গ. মসলিন কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান -

১. নারায়ণগঞ্জ

২. সোনারগাঁও

৩. গুলিস্তান

৪. নওগাঁ

ঘ. ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল -

১. পূর্ব বাংলার রাজধানী

২. দক্ষিণ বাংলার রাজধানী

৩. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী

৪. উত্তর বাংলার রাজধানী

ঙ. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন -

১. ইশা খাঁ

২. তিতুমীর

৩. আলীবর্দি খাঁ

৪. নবাব আহসানউল্লাহ

চ. ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব -

১. ২৭ কিমি

২. ২২ কিমি

৩. ২৫ কিমি

৪. ২৮ কিমি

৪. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

সমৃদ্ধ এলাকা

গোয়ালদি

প্রাচীন মসজিদ

লোকশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা

মসলিন কাপড়

সোনারগাঁও এর শাসনকর্তা

জয়নুল আবেদিন

জগৎ জোড়া খ্যাত

ইশা খাঁ ছিলেন

পানাম নগর

৫. আমার নিজের গ্রাম বা শহরের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করি।

৬. একই অর্থ বোঝায় এরকম কয়েকটি শব্দ লিখি।

- ফুল - পুষ্প, কুসুম, মঞ্জরী, প্রসূন, পুষপক
পানি - জল, বারি, সলিল, নীর, অস্ত্র
পৃথিবী - জগৎ, ধরণী, ধরিত্বি, ভূবন, বসুন্ধরা
নদী - তটিনী, গাঁঁ, প্রবাহিণী, কল্লোলিনী
পতাকা - কেতন, ঝাঙ্গা, নিশান, বৈজয়ত্বী, ধূজা

৭. বিপরীত শব্দ লিখি।

সকাল	বিকাল
যাওয়া
আনন্দ
মিষ্টি
রোদ
প্রথম

৮. কর্ম অনুশীলন।

ক. মনে কর, একজন বিদেশির সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে। যিনি আগে কখনো বাংলাদেশে আসেননি। তিনি বাংলাদেশের আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য কোথায় যাবেন, তা তোমার কাছে জানতে চাইলেন। সেক্ষেত্রে তুমি তাকে কোথায় যাওয়ার পরামর্শ দেবে এবং কেন?

খ. নিচের যেকোনো একটি বিষয় নিয়ে ৮টি বাক্য লিখি।

সোনারগাঁও

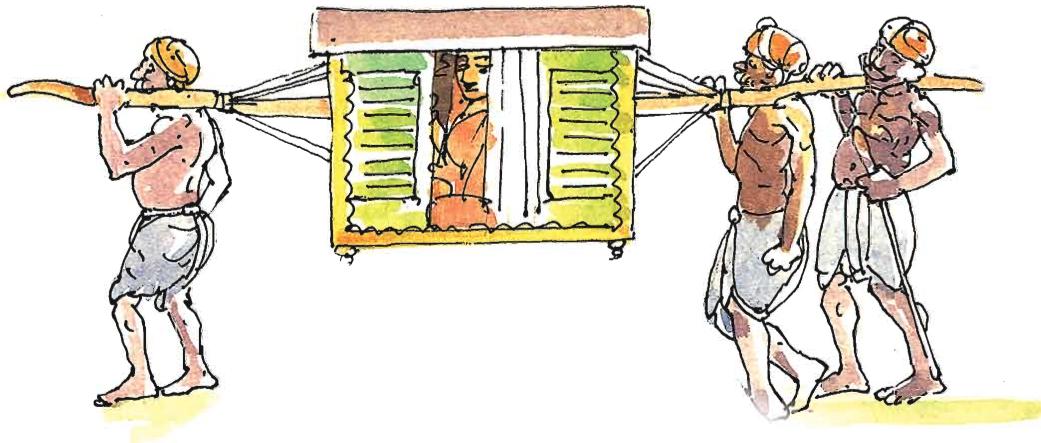
জাদুঘর

অতিসৌধ

শহিদ মিনার

বীরপুরুষ

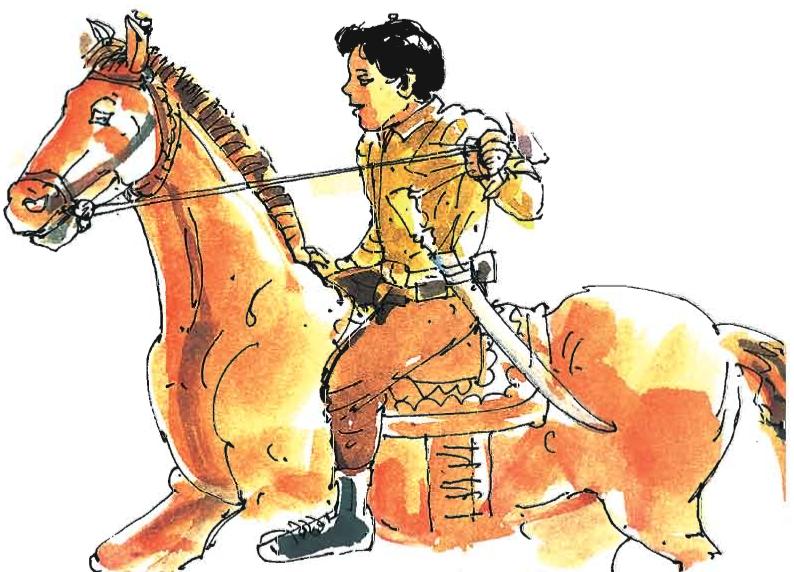
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙ্গা ঘোড়ার 'পরে
টগ্বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙ্গা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধে হলো, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।

ধু ধু করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ-ভাবছ, ‘এলেম কোথা !’
আমি বলছি, ‘ভয় করো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।’



আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে—
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
‘দিঘির ধারে ওই—যে কিসের আলো!’
এমন সময় ‘হাঁরে রে রে রে রে
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর—দেবতা ঝরণ করছ মনে,

বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
‘আমি আছি, তয় কেন মা করো!’



তুমি বললে, ‘যাস নে খোকা ওরে’,
আমি বলি, ‘দেখো—না চুপ করে।’
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার বন্ধনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হলো মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কতো লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কতো লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে,
ভাবছ খোকা গেলাই বুঝি মরে।

আমি তখন রান্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, ‘লড়াই গেছে থেমে’,
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিছ আমায় কোলে
বলছ, ‘ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হতো তা না হলে!’

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

শিশুরা কল্পনা করতে ভালোবাসে। এই কবিতাটিও তেমনি এক ছেউ শিশুর কল্পনা। কল্পনায় সে মায়ের সঙ্গে দূর দেশে যায়। পথে সে ডাকাতদের মোকাবিলা করে, বীরের মতো লড়াই করে মাকে রক্ষা করে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

টগবগিয়ে রাঙা পাট জোড়াদিঘি শ্রবণ বেয়ারা (বেহারা) থরোথরো
বানবানিয়ে দুর্দশা সেঁতা

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. খোকা মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?

খ. মা ও খোকা কীভাবে যাচ্ছে?

গ. তারা কখন জোড়াদিঘির ঘাটে পৌছাল? এমন সময় কী ঘটল?

ঘ. বেয়ারারা কোথায় পালাল?

ঙ. ‘ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল’ – মা একথা বললেন কেন?

চ. বীরপুরুষ কে? সে কাদের হারিয়ে বীরপুরুষ হলো?

৪. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থের পার্থক্য জেনে নিই ও শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্যগুলো শুধু উচ্চারণে পড়ি।

কাটা – অস্ত্রাগ মাসে ধান কাটা শেষ হয়েছে।

কঁটা – চোরাক্ঁিটায় মাঠ ভরে আছে।

কোন – তুমি কোন কাজ করবে?

কোণ – ঘরের কোণে বসে থাকলে চলবে না, কাজে নেমে পড়ো।

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই ও বাক্য তৈরি করি।

ভয়	—	সাহস,	সাহসের কাছে সবাই পরাজিত হয়।
বিদেশ	—	স্বদেশ,
দূরে	—	কাছে,
সকাল	—	সন্ধিয়া,
আলো	—	আঁধার, অন্ধকার,

৬. ‘বীরপুরুষ’ কবিতায় ‘ধু–ধু’ শব্দ আছে, এ রকম আরও শব্দের ব্যবহার জেনে নিই।

ধু–ধু	—	চারদিকে মানুষজন নেই, গ্রামটা যেন ধু–ধু করছে।	
হু–হু	—	হু–হু করে হাওয়া বইছে।	
সোঁ–সোঁ	—	সোঁ–সোঁ করে বাতাস ছুটছে।	
ঝনঝন	—	কাচের আয়নাটা ঝনঝন করে ভেঙে গেল।	
ভনভন	—	ময়লা জায়গাটায় ভনভন করে মাছি উড়ছে।	

৭. কবিতাটি স্ফট ও শুল্ক উচ্চারণে স্থাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম–অনুশীলন।

আমি যদি বীরপুরুষ হতাম তাহলে কী করতাম তা লিখে জানাই।



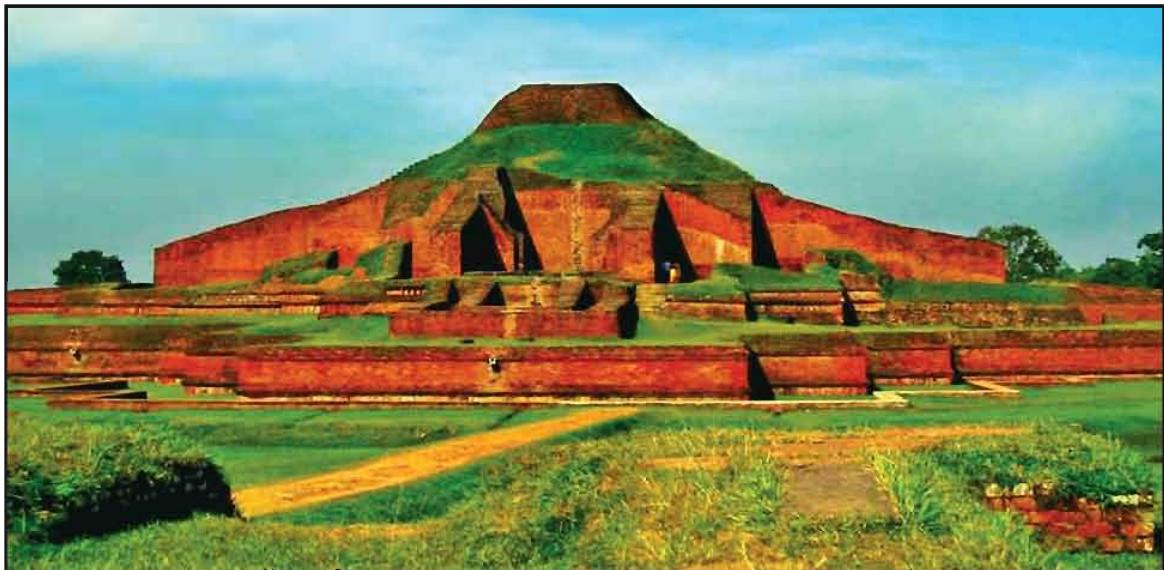
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি গরিচিতি

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনা ভাগ্নার বিশাল। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক রচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি বহু চিঠিপত্র লিখেছেন। ‘বীরপুরুষ’ কবিতাটি ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাহাড়পুর

চারিদিকে কোনো পাহাড় নেই, কিন্তু জায়গার নাম পাহাড়পুর। এটি বাংলাদেশের এমনকি বিশ্বের একটি বিখ্যাত জায়গা। কিন্তু এর সম্পর্কে সবাই খুব ভালো জানে না। তোমরা কি জান যে, পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার?



পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

প্রায় ১৪শ বছর আগে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ভিক্ষুগণ কোনো বিশেষ একটা জায়গায় থাকতেন। সেখানে তাঁরা নিজেদের ধর্মচর্চা করতেন আর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এরকম জায়গার নাম বিহার। বাংলাদেশের ভিতরে আরও বিহার আছে, যেমন কুমিল্লার ময়নামতির শালবন বিহার। কিন্তু পাহাড়পুরের মতো বড় বিহার আর নেই। প্রাচীন এ বিহার একসময় খালি পড়ে থাকে। অনেকে মনে করেন যুগ্যুগ ধরে উড়ে আসা ধূলাবালি ও মাটি এটির চারিদিকে জমতে থাকে। একসময় মাটির স্তূপে এটি ঢাকা পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। সেই থেকে নাম হয়ে যায় পাহাড়পুর। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন। এটির আরেক নাম সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার।

এই বিহারটি নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। বিহার এলাকাটি প্রায় ৪০ একর জায়গা জুড়ে লালচে মাটির ভূমিতে বিস্তৃত। ২৭ একর জমির উপর এর বিশাল দালান। উত্তর-দক্ষিণে এটি ৯২২ ফুট আর পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট বিস্তৃত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল প্রায় ১২শ বছর আগে এটি নির্মাণ করান।

একদম নিচে মাটির অংশে এটি চারকোনা আকারের। বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানান রকম ফুল-ফল, পাখি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানানো আছে। উভ্রে দিকের ঠিক মাঝখানে মূল দরজা। তার পরেই বড় হলঘর। পাশে দুটি ছোট হলঘর। চারিদিকে দেয়ালের ভিতরে সুন্দর সারি বাঁধা ১৭৭টি ছোট ঘর। সামনে দিয়ে আছে লম্বা বারান্দা। বিহারটিতে আছে পুকুর, কৃপ, স্নানঘাট, স্নানঘর, রান্নাঘর, খাবারঘর ও শৌচাগার। সব মিলিয়ে বিহারটিতে ৮০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা ছিল। পাহাড়পুর ছিল উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।



পাহাড়পুর বিহারের পোড়া মাটির ক্ষেত্র

ভিতরটায় বিশাল উঠানের মাঝখানে বড় এক সুন্দর মন্দির। ধাপে ধাপে উঁচু করে মন্দিরটা বসানো হয়েছে। এখানেও পোড়ামাটির দুই হাজার ফলকের চিত্র দিয়ে মন্দিরের বাইরে আর ভেতরে সাজানো। একই রকম ছোটছোট মন্দির পুরো বিহারের নানান জায়গায় আছে। বিহারটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দেয়ালের বাইরে একটা বাঁধানো ঘাট আছে। এটাকে বলা হয় সম্ম্যাবতীর ঘাট।

পাহাড়পুর বিহারের পাশে আছে দেখার মতো একটা জাদুঘর। সেখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে বিহার থেকে খনন করে পাওয়া অনেক পুরাতন আর দুর্লভ জিনিসপত্র।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বিহার সুপ্রাচীন ভিক্ষু স্তূপ বিশাল প্রাণকেন্দ্র দুর্লভ আবিষ্কার ম্লানঘাট
ধর্মচর্চা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রাণকেন্দ্র স্তূপ দুর্লভ বিশাল বিহার সুপ্রাচীন

ক. পাহাড়পুর ছাড়াও আমাদের দেশে আরও রয়েছে।

খ. আমাদের দেশে মঠ রয়েছে।

গ. টেবিলের উপর ধূলোবালি পড়ে ময়লার হয়ে আছে।

ঘ. আকাশ অনেক।

ঙ. ঢাকা বাংলাদেশের।

চ. জাদুঘরে অনেক জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ভিক্ষুগণ থাকতেন -

১. বৌদ্ধ বিহারে

২. পাহাড়পুরে

৩. বদলগাছিতে

৪. জামালপুরে

খ. আলেকজান্ডার কানিংহাম এই পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন -

১. ১৭৭৯ সালে

২. ১৮৭৯ সালে

৩. ১৯৭৯ সালে

৪. ১৬৭৯ সালে

গ. বিহার এলাকাটি বিস্তৃত -

১. ৫০ একর জুড়ে

২. ৪০ একর জুড়ে

৩. ৬০ একর জুড়ে

৪. ৩০ একর জুড়ে



৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. পাহাড়পুর নামটা কীভাবে হলো?
- খ. এখানে কতবছর আগে কারা থাকতো?
- গ. বিহারটির মাঝখানে কী কী আছে?
- ঘ. বৌদ্ধ বিহারটির মাটি ও দেয়াল কোন রঙের এবং কী দিয়ে তৈরি?

৫. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে বাক্য পড়ি ও লিখি।

পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন	১৭৭টি ছেট ঘর।
ভিক্ষুগণ সেখানে	সোমপুর মহাবিহার।
মাটির স্তুপে ঢাকা পড়ে	বৌদ্ধবিহার।
পাহাড়পুরের আরেক নাম	সম্ম্যাবতীর ঘাট।
ভিতরে সুন্দর সার বাঁধা	পাহাড় হয়ে যায়।
বিহারের দক্ষিণ কোণে রয়েছে	ধর্মচর্চা করতেন।

৬. বাক্য রচনা করি।

ভিক্ষু ধর্মচর্চা আবিষ্কার প্রাণকেন্দ্র স্নানঘাট

৭. কথাগুলো বুঝে নিই।

উড়ে আসা – বাতাসের সঙ্গে যা কিছু উড়ে আসতে পারে তাকে বলে উড়ে আসা, যেমন
উড়ে আসা গাছের পাতা, উড়ে আসা পাখি ইত্যাদি।

পাড়ি দেওয়া – এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌছানো বা পার হওয়াকে বলা হয়
পাড়ি দেওয়া। যেমন–সাত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সবার কাজ নয়।

দুর্লভ জিনিসপত্র – যেসকল জিনিস সহজে লভ্য বা পাওয়া যায় না তাকেই দুর্লভ জিনিসপত্র
বলে।

৮. কর্ম অনুশীলন।

- ক. পাহাড়পুর পাঠে যেসব স্থান ও ব্যক্তির নাম আছে সেসব নামের একটি তালিকা তৈরি
করি। আমার তালিকাটি পাশের বন্ধুর সাথে মিলিয়ে নিই।
- খ. ময়নামতির ‘শালবন বিহার’ দিয়ে ৫টি বাক্য লিখি।

লিপির গল্প

শিক্ষক : আমি আজ একটি গল্প বলব। গল্প হলেও এর কিছুটা সত্য, কিছুটা অনুমান, আর কিছুটা বানানো।

মনজুলা : স্যার, আমারও গল্প বানাতে ভালো লাগে।

শিক্ষক : খুব ভালো। গল্প বানাতে হলে কিন্তু গল্প শুনতে হবে, গল্প পড়তে হবে, গল্প লিখতেও হবে।



রাজা গণেশের আমলে মুদ্রার বাঞ্ছা
অঙ্করের প্রতিলিপি



সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের
আমলের পাথরে খোদিত বাঞ্ছা লেখা

আলো : আচ্ছা, এখন আমরা গল্প শুনব। কিন্তু কোন গল্প? রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প,
বেংগামা-বেংগামির গল্প, নাকি সুয়োরানি-দুয়োরানির গল্প?

শিক্ষক : তোমরা অনেক গল্প জান। আজ একটা গল্প বলব। লিপির গল্প।

অন্জু : লিপির গল্প! শুনি নি তো কোনো দিন!

শিক্ষক : লিপি মানে লেখা। কোনো শব্দ শুনে লেখা, জিনিস দেখে লেখা। চিত্তা করে মনের
কথা লেখা। এই লেখা কেমন করে মানুষ পেল, কেমন করে আবিষ্কার করল, কেমন
করে অভ্যাস করল তাই বলব। লিপির গল্প মানে লেখার ইতিহাস।

হাসান : মজা তো!

শিক্ষক : অনেক দিন আগের কথা। একশো, দুশো বছর নয়। এক হাজার দুহাজার বছর নয়।
প্রায় ছয়-সাত হাজার বছর আগে পৃথিবীতে লোকজন লিখতে ও পড়তে জানত না।
জানবে কী করে? তখন তো বর্ণ বা অক্ষর কিছুই ছিল না।

আদিত্য : অঁয়া, বর্ণমালা ছিল না? অক্ষরও ছিল না, মানে আ আ ক খ কিছুই ছিল না।

শিক্ষক : সত্যিই কোনো ভাষার কোনো বর্ণমালা, অর্থাৎ অক্ষর বা হরফ কিছুই ছিল না। তখন লেখাপড়া জানা লোক ছিল না, সাক্ষর লোক ছিল না।

আমিনা : তাহলে তারা চিঠি লিখত কী করে?

শিক্ষক : তখন চিঠিপত্র ছিল না, বইপত্র ছিল না, কালি-কলম ছিল না। আমাদের বাবা, মা, দাদি ছোটদের জন্য গল্প বানাতেন আর পাহাড়ের গুহায় বসে রাতে চাঁদের আলোতে গল্প বানিয়ে বানিয়ে শিশুদের ঘূম পাড়াতেন। বড়রা গল্প করতেন আর ছোটরা গল্প শুনত। গল্প শুনে শুনে বড় হয়ে নিজেরা আবার ছোটদের গল্প শোনাত।

অ-ম মনমন্মত ই-ঃ-ন ত হ হ ই	ৰ-ৰ ম ম ম ম	ফ-৬ হ হ হ হ
উ-ট ট ট ট	ঞ-ঞ ঞ ঞ ঞ	ব-ং ং ং ং
এ-ড দ দ দ	ট-ট ট ট	ড-ন ন ন ন
ও-১ ১ ৩ ৩	ঢ-০ ০ ০ ০	ঢ-৪ ৪ ৪ ৪
ক-+ + + ক	ড-২ ২ ২ ২	য-ং ূ ূ ূ ূ
খ-২ ২ ২ খ	চ-৫ ৫ ৫ ৫	র-। । । ২ ২
গ-৮ ৮ ৮ গ	ণ-। । । । ণ	ল-ং ৮ ৮ ৮ ৮
ঘ-৮ ঘ ঘ ঘ	ত-। । । । ৮	ব-৬ ৬ ৬ ৬ ৬
ঙ-৮ ৮ ৮ ৮	থ-০ ০ ০ ০	শ-৮ ৮ ৮ ৮ ৮
চ-১ ১ ১ চ	দ-১ ১ ১ ১	ষ-৮ ৮ ৮ ৮
ছ-৩ ৩ ৩ ছ	ধ-০ ০ ০ ০	স-৮ ৮ ৮ ৮
জ-ঃ ঃ ঃ ঃ	ন-। । । ।	হ-৮ ৮ ৮ ৮
	প-৮ ৮ ৮ ৮	

বাংলা বর্ণের ক্রমবিকাশ

সুজিত : আচ্ছা, ভুলে গেলে কী করত?

শিক্ষক : খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ। ভুলে গেলে তখন আর গল্প বলতে পারত না। আবার নতুন করে নতুন গল্প বানাতে হতো। সে জন্যই ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য লিপি তৈরির চিন্তা মাথায় এল। শুন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করার ফন্দি হলো লিপি।

নাহিদ : এখন যেমন কথাবার্তা, গানবাজনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা ক্যাসেটে ধরে রাখা হয় সে রকম ?

শিক্ষক : ঠিক বলেছ, অনেকটা তাই। এখন যন্ত্রের বাস্তে কথাকে বন্দি করে রাখা হয়। তখন হাতে আঁকা রেখায় কথাকে বন্দি করে রাখা হতো। কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করে রাখার জন্যই তৈরি হলো লিপি। লিপিকে কেউ বলেন লিখন পদ্ধতি। কেউ বলেন বর্ণমালা। কেউ বলেন হরফ। কেউ বলেন অক্ষর। কেউ বলেন অ্যালফাবেট। মানুষ একদিন লিপি দিয়ে কথাকে বন্দি করে রাখতে শিখল। আর সেদিন থেকেই মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো।

হাসান : লিপি আবিষ্কার করলেন কে ?

শিক্ষক : প্রাগৈতিহাসিক কালে কে কখন কীভাবে লিপি আবিষ্কার করেছিলেন তা কেউ ঠিকভাবে বলতে পারবে না। আধুনিক কালে যাঁরা এ ধরনের কাজ করেছেন তাদের কারও কারও নাম জানা যায়। যেমন, কোরিয়ার রাজা সে জং এবং ইউরোপের এক ধর্মবাজক সন্ত সিরিল।

টমাস : বাংলা লিপি কীভাবে এল ?

শিক্ষক : বাংলা লিপি কে প্রচলন করেছেন তা জানা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে অশোক লিপি, অশোক লিপি থেকে কুটিল লিপি এবং কুটিল লিপি থেকে বঙালিপি। তবে লিপির নানা ধাপ পেরিয়ে বঙালিপি থেকেই বাংলা লিপি এসেছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

শিউলি : স্যার পৃথিবীতে কত লিপি ছিল ?

শিক্ষক : কত লিপি ছিল তা সঠিক কেউ জানে না। তবে অনেক লিপি কালে কালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক লিপির নমুনা পাওয়া গেছে, যেমন: মহেঝেদারোর লিপি, মিশরীয় লিপি। তবে এগুলোর পাঠ উদ্ধারের জন্য এখনও ভাষাবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা আরও গবেষণা করছেন। তোমরা বড় হয়ে প্রাচীন লিপি সম্পর্কে আরও জানতে পারবে।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

লিপির গল্পটি একটি কথোপকথনধর্মী রচনা। ভাষার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে কীভবে ধীরে ধীরে বর্ণমালা রূপ পেয়েছে এই রচনায় তার ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আলোচনার মাধ্যমে লিপিমালা আবিষ্কারের তথ্য জানানো চেষ্টা করা হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অভ্যাস সাক্ষর বন্ধন বঙালিপি রূপান্তর

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অভ্যাস বন্ধন সাক্ষর রূপান্তর বঙালিপি

ক. লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

খ. ঢাঁ খাওয়ার সময় বাবার পত্রিকা পড়ার।

গ. বাক্যটি সাধু থেকে চলিত ভাষায় কর।

ঘ. বাংলা লিপির পুরানো নাম।

ঙ. মানুষের সাথে মানুষের দৃঢ় হোক।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করি।

তুমি খুব প্রশ্ন করেছ।

আবার নতুন করে নতুন বানাতে হতো।

লিপিকে কেউ বলেন।

বঙালিপি থেকেই এসেছে।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বিপরীত শব্দ লিখি ও বাক্য রচনা করি।

বিলুপ্ত —

শিক্ষক —

আনন্দ —

চিন্তা —

আবিষ্কার —

সাক্ষর —

প্রাচীন —

৬. মুখে মুখে উভয়ের বলি ও লিখি।

ক. লিপি বলতে কী বুঝি?

খ. লিপি তৈরির চিন্তা এলো কীভাবে?

গ. লিপি আবিষ্কারকদের নাম লিখি।

ঘ. বাংলা লিপি কীভাবে এলো?

ঙ. কখন থেকে মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো?

৭. বুঝিয়ে বলি।

শুন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করার ফন্দি হলো লিপি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

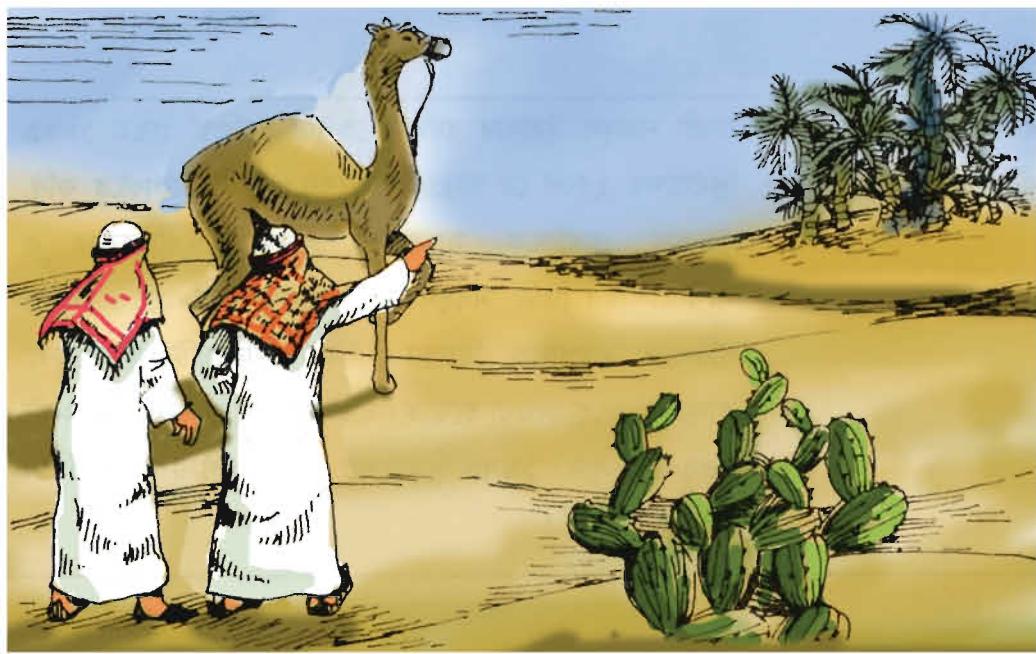
নাটিকাটি শিক্ষকের সহায়তায় অভিনয় করি।

খলিফা হযরত উমর (রা)

হযরত উমর ফারুক (রা) পবিত্র মক্কা নগরীতে ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান্তাব ও মাতার নাম হানতামাহ।

তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি শিক্ষিত, মার্জিত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় সুনাম অর্জন করেন। বড় হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। তিনি ছিলেন নামকরা কুস্তিগির, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্ত্বা।

হযরত উমর (রা) প্রথমে ছিলেন ইসলামের ঘোরতর বিরোধী। মহানবি (স) কে হত্যা করার জন্য তিনি কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে জানতে পারেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগিনীপতি সাইদ মুসলমান হয়ে গেছেন। এতে তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে বোনের বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি ইসলামের প্রতি বোন ও ভগিনীপতির দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়ে যান। তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং নবি করিম (স) এর দরবারে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান হয়ে তিনি দৃঢ় কর্তৃ ঘোষণা দিলেন, ‘আর গোপনে নয়, এবার প্রকাশ্যে কাবা ঘরের সামনে সালাত আদায় করব।’ মহানবি (স) খুশি হয়ে তাঁকে উপাধি দেন ‘ফারুক’ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী।



হ্যরত উমর (রা) একদিকে ছিলেন কোমল, অন্যদিকে ছিলেন কঠোর। তিনি মানুষের দুঃখ কফ্টে
ছিলেন সম্বয়ী। দেশের মানুষের দুঃখ কফ্টের কথা অবহিত হওয়ার জন্য তিনি গভীর রাতে মহল্লায়
মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে তিনি নিজের কাঁধে আটার বস্তা
বহন করে নিয়ে তাদের তাবুতে যেতেন। তিনি সহধর্মী উম্মে কুলসুমকে নিয়ে এক বেদুইনের ঘরে
যান, তার অসুস্থ স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য।

খলিফা উমর (রা) এর বিচার ব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। আইনের চোখে উচ্চ-নিচু, ধনী-গরিব,
আপন-পর কোনো ভেদাভেদ ছিল না। গুরুতর অপরাধে নিজের ছেলে আবু শাহমাকে তিনি কঠোর
শাস্তি দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে সম্পাদন
করতেন।

একদিন তিনি এক ক্রীতদাসকে সাথে নিয়ে জেরুজালেম যাচ্ছিলেন। তিনি সঙ্গীকে বললেন, “দুইজন
দূরের পথ পাড়ি দেব। একবার ভূমি উটে চড়বে আর একবার আমি।” এভাবে যখন তাঁরা জেরুজালেম
শহরের নিকট পৌছালেন তখন ক্রীতদাসের উটে চড়ার পালা। উটের পিঠে ক্রীতদাসকে দেখে
শহরের লোকজন মনে করল ইনিই খলিফা। তারা উটের পিঠে বসা ক্রীতদাসকে খলিফা হিসাবে
সালাম দিতে লাগলেন। ক্রীতদাস তখন লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি নই, উটের চালকই খলিফা।”
উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়ে গেল হ্যরত উমর (রা) এর মহানুভবতা দেখে।

হ্যরত উমর (রা) ছিলেন মানব দরদি। ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মতো শাসকদের জন্যও
রয়েছে একই আইনের বিধান। একবার হ্যরত উমর (রা) কে একজন সাধারণ লোকের সামনে
জবাবদিহি করতে হয়েছিল। অভিযোগটি ছিল এই যে, ‘বায়তুলমাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে কারও
পুরো একটি জামা হয় নি, অথচ খলিফার গায়ে সেই কাপড়ের পুরো একটি জামা দেখা যাচ্ছে।
খলিফা অতিরিক্ত কাপড় কোথা থেকে পেলেন?’ খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ উত্তর
দিলেন, “আমি আমার অংশটুকু আবাকাকে দিয়েছি। এতে তাঁর জামা তৈরি হয়েছে।” তিনি কোষাগার
থেকে মাত্র দুই দিরহাম গ্রহণ করতেন, আর বলতেন “যদি না নিয়ে পারতাম তা হলে জনগণের টাকা
নিতাম না।”

এই জনদরদি শাসকের কথা লোকমুখে শুনে রোম সম্রাট পত্র দিয়ে এক দৃত পাঠান। সম্রাটের দৃত
আরব দেশে এসে প্রথমে খোজাখুঁজি করেন ‘খলিফা ভবন’। কোনো লোকই খলিফা ভবন দেখাতে
পারেন নি। শেষে একজন বললেন, কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম খেজুর গাছের ছায়ায় খলিফা
ঘূর্মোচ্ছেন। রোম সম্রাটের দৃত তাঁকে খেজুর গাছের ছায়ার নিচে ঘূর্মোতে দেখে অবাক হন। তিনি
বুঝতে পারেন হ্যরত উমর (রা) জনগণের প্রকৃত নেতা।

হয়রত উমর (রা) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ইসলাম ধর্ম প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁর ধনসম্পদ বিলিয়ে দেন। তিনি মহানবি (স) এর সঙ্গী হয়ে বীরত্বের সাথে সব যুদ্ধে অংশ নেন। এই বীরপুরুষ ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইসলামের এই মহান খলিফা নিজের জীবনে অনেক ভালো কাজ করেছেন এবং আমাদের জন্যও অনেক উপদেশ রেখে গেছেন। তাঁর দেওয়া উপদেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

‘আগে আগে সালাম দেওয়া। কোনো কাজ করার আগে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নেওয়া। যেকোনো কাজ মনোযোগ দিয়ে করা। সবার প্রতি সুবিচার করা।’

তাঁর মহৎ জীবন ও মহান উপদেশ যুগ যুগ ধরে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে ও ভালো কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।
কৃষ্ণগির কোষমুক্ত যোদ্ধা সুবক্তা বিস্মিত সালাত ব্যাকুল ফারুক স্বীয় সংমিশ্রণ পুষ্প দিরহাম বায়তুলমাল জবাবদিহি পত্র
২. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

মক্কা, কুরাইশ
হানতামাহ, খাত্বাব
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা
ক্রীতদাস, জেরুজালেম
সমব্যথী

 - ক. হযরত উমর (রা) ছিলেন
 - খ. একদিন তিনি এক সঙ্গী নিয়ে যাচ্ছিলেন
 - গ. হযরত উমর (রা) পবিত্র নগরীতে বৎশে জন্মগ্রহণ করেন।
 - ঘ. তাঁর মাতার নাম ও পিতার নাম।
 - ঙ. তিনি মানুষের দুঃখকষ্টে ছিলেন।

৩. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মিল করি।

শিক্ষা	নির্জনে
শত্রু	বাণিজ্য
সুনাম	মিত্র
ব্যবসা	বদনাম
প্রকাশ্য	মহৎ কাজ

৪. বাক্য গঠন করি

খলিফা চরিত্র তরবারি নিখুঁত শাস্তি কোমল কঠোর দরদি আদর্শ কোষাগার।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. হ্যরত উমর (রা) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
- খ. তাঁর মাতাপিতার নাম কী ?
- গ. তিনি কীভাবে মুসলমান হলেন ?
- ঘ. হ্যরত মুহাম্মদ (স), উমর (রা) কে কী উপাধি দিয়েছিলেন ?
- ঙ. হ্যরত উমর (রা) এর বিচার ব্যবস্থা কেমন ছিল ?
- চ. প্রজাদের প্রতি হ্যরত উমর (রা) এর ভালোবাসার একটি উদাহরণ দাও।
- ছ. হ্যরত উমর (রা) এর উপদেশগুলো কী কী?

৬. হ্যরত উমর (রা) সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি ও পড়ি।

.....

.....

.....

.....

.....

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ
অ

অকুতোভয়

অগোচর

অগ্রদৃত

অঙ্গা

অঞ্চল

অতিক্রম

অদশ্য

অধিকার

অনুবীক্ষণ

অবজ্ঞা

অবাধি

অবিমূরণী

অভ্যর্থনা

অভূতপূর্ব

অভ্যাস

অসহ্য

অসুখ-বিসুখ

অস্ত্র

অঙ্গামী

অশ্রদ্ধা

আ

আদুল

অ্যানটেনা

আবদার

আবিষ্কার

আলিঙ্গন করা

আয়েস

ই

ইলশেঁগুড়ি

ইতি টানা

উ

উদারতা

উৎভাবন

উন্নতি

এ

একরণ্তি

এসএমএস

ঞ

ঐতিহাসিক

ক

ক্ষুর

কদর

কদলী

কামার

অর্থ

- তয় নেই যার।
- চোখের আঢ়ালে থাকা।
- যিনি পথ দেখান, সবার আগে আগে চলেন।
- দেহ, শরীরের অংশ।
- স্থান, দেশের ভূখণ্ডের বিভাগ, রাজ্য।
- কোনো কিছু পার হওয়া বা ছাঢ়িয়ে যাওয়া।
- যা চোখে দেখা যায় না, অগোচর।
- দাবি, পাওনা জিনিসের উপর দখল নেওয়া।
- মাইক্রোস্কোপ, এমন একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে ছোট জিনিসকে বড় দেখা যায়।
- তাচিল্য, তুচ্ছ।
- পর্যন্ত।
- তুলবার নয় এমন।
- সাদরে প্রহণ।
- পূর্বে যা দেখা যায় নি বা ঘটে নি।
- স্বভাব।
- যা সহ্য করা বা সওয়া যায় না।
- রোগ-ব্যাধি।
- হাতিয়ার।
- পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে এমন।
- অবজ্ঞা, ঘৃণা।

- খালি গায়ে বা জামাকাপড় ছাড়া।
- কোনো বেতার যন্ত্রের সাথে লাগানো তার বা অংশ যা দিয়ে যন্ত্রটি তরঙ্গ ধরতে পারে।
- বায়না।
- উষ্ণাবন, নতুন কিছু তৈরি।
- কোলাকুলি করা।
- আরাম।

- হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এ ধরনের বৃষ্টিতে নদীতে জাল ফেলে জেলেরা ইলিশ মাছ অনেক বেশি পায়। এ কারণেই এমন বৃষ্টির নাম ইলশেঁগুড়ি।
- শেষ করা।

- সরলতা।
- আবিষ্কার করা, আগে ছিল না এমন কিছু তৈরি করা।
- কিছুটা খারাপ অবস্থা থেকে ভালো অবস্থায় যাওয়া।

- সামান্যতম, অতিশয়, অল্প।
- (Short Message Service) ক্ষুদেবৰ্ত।
- ইতিহাস সত্রান্ত।

- দোষ।
- মান্য, সম্মান, খাতির।
- কলা।
- যারা লোহা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন।

কুমার
কুন্তিগির
ক্রুণ
কষে
কৃষিকাজ
ক্ষেত্র-
কোষমুক্ত
ক্রলিং

ক
ক্ষীর

খ
খনি
খাপা
খাবলে খাওয়া

থাস
থ্যাত

গ
গগন
গবেষক
গম্ভুজ
গীঘ
ঘ

ঘনিয়ে এলো
ঘুম
ঘোড়ার নাগের চাট
ঘ্যাচাঁঘ্যাচ

চ
চত্বল
চমৎকার
চর

চাষাবাদ
চিরস্মরণীয়
চিলেকেঠা
চেটেপুটে

চৌকাঠ

ছ
ছিনু

জবাবদিহি

জমিদার

জয়ঢাক

জ্ঞানী

জন্মভূমি

জোনাই

জোড়াদিঘি

ঝ

ঝনবনিয়ে
ঝুটি
ঝুপঝাপ

- কুমোর। যারা মাটি দিয়ে ইঁড়ি, সরা ইত্যাদি তৈরি করেন।
- কুষ্ঠি খেলোয়াড়।
- কাতর, বেদনাপূর্ণ।
- জোরে।
- চাষাবাদ।
- দুঃখ, কষ্ট।
- খাপ থেকে বের করে আনা।
- যুদ্ধকালে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

- দুধ দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন।

- মূল্যবান পদার্থের প্রাকৃতিক উৎস।
- রাগান্বিত হওয়া।
- খাবলা মানে হাতের থাবা পরিমাণ। খাবলে খাওয়া বললে এক থাবায় যতটুকু তুলে খাওয়া যায় তাই বোঝায়।
- আসল, প্রকৃত।
- সুপরিচিত, বিখ্যাত।

- আকাশ
- যিনি গবেষণা করেন।
- ছুড়া।
- গৱর্মকাল, বাল্লা ছয়টি খাতুর প্রথম খাতু।

- ঘন হয়ে এলো, আসন্ন।
- তন্দুর, নিদুর।
- ঘোড়ার পায়ের লাথি।
- এক কোপে কিছু কেটে ফেলার আওয়াজ।

- অস্থির, অশান্ত, চটপটে।
- সুদর, মনোহর।
- গোপন খবর সঞ্চাহ করে দেন যিনি। যুদ্ধের কোশল হিসেবে এই চর নিয়োগ করা হয়।
- কৃষিকাজ।
- সব সময় মানুষ যাকে অরণ করে, মনে রাখে।
- বাড়ির ছাদে লাগোয়া ঘর। সিড়িঘর।
- চাটা মানে জিহ্বা দিয়ে সেহন করা। জিহ্বা আর ঠোঁট দিয়ে একসাথে চেটে-চুম্ব খেলে হয় চেটেপুটে খাওয়া।
- দরজার চারিদিকের কাঠের চারকোনা কাঠামো বা ফ্রেম।

- ছিলাম।

- কৈফিয়ত দেওয়া।
- ধনী ব্যক্তি, যিনি বহু জমি ও বিষয় সম্পত্তির মালিক।
- জয়ী হওয়ার পর যে ঢাক (এক ধরনের বাদ্য) বাজানো হয়।
- জ্ঞানবান লোক, ধীর অনেক জ্ঞান।
- যে ভূমি বা দেশে একজন জন্মায় সে দেশ তার জন্মভূমি।
- জোনাকি পোকা।
- যেখানে পাশাপাশি দুটি দিঘি রয়েছে।

- ঝনবান শব্দ করে।
- শীৰ্ষস্থান, খোপা।
- পতনের শব্দ।

ট

টগবাগিয়ে

টজ্জা

ঠ

ঠা-ঠা আলো

ঠেকায়

ত

তবলা

তাপ

তেরঙ্গা

ধ

ধরন

দিগবিজয়

দিদি

দিরহাম

দুধের চাঁচি

দুর্দশা

দুর্গত

দৃত

দৃঃসাহসিক

ধ

ধর্মচর্চা

ধায়

ধূকছে

ধূলিসাং

ন

নবান্ন

নবীন যাত্রী

নারী জাগরণ

নাশ

নিদর্শন

নিন

নিঝলা

নিয়ন্ত্রণ

নেবু

প

পথ-প্রান্তর

পরান

পশ্চতু

প্যাচ

পরিবেশ

পরিশ্রম

পাট

পাটা

পাঠশালা

পাঢ়

পালকি

পুল্প

পেঁজা

প্রসাদ ভোজন

প্রতিষ্ঠা

প্রজাতি

প্রাণকেন্দ্র

প্রসিদ্ধ

প্রাতফর্ম

- পানি ফুটবার মতো শব্দ করে, ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ করে।
- এক ধরনের গাড়ি।

- এত তেজি আলো যে চোখ মেলে তাকানো যায় না।
- বাধা দেয়, মানা করে।

- এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র।
- উষ্ণতা।
- টিনের তৈরি সুটকেস আকারের বাক্স। (সুটকেস চামড়ার তৈরি হয়।)
- প্রচন্ড কম্পন।

- মমতা, টান।
- চারদিকের নানান জায়গা জয় করা।
- বড় বোন, আপা।
- আরবে প্রচলিত মুদ্রার নাম।
- দুধের শুষ্ক অংশ যা পাত্র থেকে চেছে তোলা হয়।
- খারাপ অবস্থা।
- যা সহজে লাভ করা যায় না বা পাওয়া যায় না।
- বার্তাবাহক।
- অত্যন্ত সাহসের কাজ।

- ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও অনুশীলন করা।
- ছেটা।
- ইঁগাছে।
- চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া।

- নতুন ধান কাটার পরে অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত একটি উৎসব।
- যারা নতুন যুগের শিশু।
- অধিকার সম্পর্কে মেয়েদের সচেতনতা।
- ধৰ্মস, নষ্টি, ক্ষয়।
- দৃষ্টান্ত।
- নিলাম।
- নিভেজল, খাঁটি।
- নিজের আয়তে আনা।
- লেবু।

- পথের পাশ, রাস্তার শেষ সীমা।
- প্রাণ।
- বাঙ্গা হিন্দি উর্দ্ধের মতো পাঠান এলাকার একটি ভাষার নাম।
- মোচড়, মোড়ানো।
- চারপাশের অবস্থা।
- খাটাখাটুনির কাজ।
- আকাশের পঞ্চম দিকের শেষ ভাগে, অস্তাচল, যেখানে সূর্য ডোবে।
- তঙ্গা, ফলক।
- বিদ্যালয়।
- কিনারা।
- মানুষ বাহিত যান বিশেষ।
- ফুল।
- তুলা ধূনে বা টেনে আঁশ বের করা।
- (গান শোনার জন্য) আশীর্বাদ বা দোয়া হিসেবে খাওয়া দাওয়া।
- তৈরি।
- নানা ধরনের, নানা জাতের।
- প্রধান জায়গা।
- বিখ্যাত।
- রেলগাড়ি থামার স্থান, উন্নত সমতল ভূমি।

ক

ফজলি আম
ফলার
ফারুক
ফৌজ

- খুবই সুগন্ধি ও মিষ্টি স্বাদের আম।
- কলা ও অন্যান্য ফলমূল দিয়ে তৈরি করা খাবার।
- সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী।
- সৈনিক।

ব

বঙ্গদেশ
বঙ্গালিপি
বস্তন
বন্দুকধারী
বান্দি
বাক
বর্ষাকাল
বাজার

- বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগের অবিভক্ত অঞ্চল।
- বাংলা ভাষার বর্ণ বা হরফ।
- বাঁধন।
- যার কাছে বন্দুক রয়েছে, যে ব্যক্তি বন্দুক ধরে রেখেছেন।
- আটক।
- কথা, শব্দ।
- বৃক্ষের সময়।
- যুদ্ধের জন্য তৈরি করা মাটির গর্ত। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা এখানে আশ্রয় নিয়ে তাদের এলাকা পাহারা দেন ও যুদ্ধ করেন।
- বাছাই করা বা ভালোমন্দ বিচার করা।
- সরকারি কোষাগার।
- শোভা, সৌন্দর্য।
- আগ্রহী, ব্যস্ত, অস্থির।
- বেড়ানো বা ঘোরাফেরা করা।
- অনেক বড়, প্রকাণ, বিস্তীর্ণ।
- বৌদ্ধ মঠ।
- নামা বর্ণ বিশিষ্ট, বিশ্বায়কর।
- অন্য জাতির, ভিন্ন জাতির বা দেশের।
- বিলাত বা ইংল্যান্ডের কোনো কিছু।
- ভেঙেচুরে যাওয়া। ধ্বনস হওয়া।
- চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ফেটে পড়া।
- অবাক হওয়া, আশ্রয়, হতবাক।
- মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য যারা সর্বশ্রেষ্ঠ।
- বীরের গল্প।
- বেদনা, দুঃখ, কষ্ট।
- যারা কাঁধে পালকি বহন করেন।
- যাতে কাজ দেয় না, কাজ হয় না।
- বাদলের ধারা।

ঙ

ঙজন
ঙন্তনিয়ে
ঙাগিনা
ঙিকু

- দেব-দেবীর আরাধনা।
- শুনতন শব্দ করে।
- বোনের ছেলে।
- বৌদ্ধদের মধ্যে যারা সংসার-ত্যাগী সন্নাশী (যারা সংসার করেন না); তাদের পরনে থাকে কাশাই (গেরুয়া) রঙের লম্বা কাপড়, মাথা থাকে মুড়ানো এবং চলা-ফেরা খাওয়া-দাওয়া সব কিছুতেই থাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য।
- মাটির উপর জন্মানো ছোট চাঁপা ফুল।
- আহার, খাওয়া।

ম

মসলিন
ময়রা
মনীয়ী
মহীয়সী
মন্ত্রণা
মাধ্সাশী
মানত

- বিখ্যাত বস্ত্র, একসময় বাংলাদেশে তৈরি হতো।
- যিনি মিষ্টি বানান।
- শিক্ষিত জনীগুণী বিখ্যাত মানুষ।
- মহান যে নারী।
- পরামর্শ।
- যে মাস আহার করে, মাসই যার প্রধান খাদ্য।
- কারো মনের ইচ্ছা পূরণ হলে সৃষ্টিকর্তাকে উদ্দেশ করে কিছু দেবার প্রতিজ্ঞা।

- ম**
 মাড়াসনে
 মিটাক
 মুঠো
 মূল
 মূলধারে বৃক্ষ
 মুক্তি
 মুক্তিবাহিনী
 মুক্তিপাগল
 মুখ
 মেশিনগান
 ম্যাপ
- ষ**
 ষতবার যায় মরা
- য**
 যাতনা
 যোদ্ধা
- র**
 রণক্ষেত্র
 রথ
 রথী
 রক্ত-পিছল
- রাঙ্গা**
 রাজত্ব
 রাবড়ি
 রাম-খটাখট
- রাজ্য**
 রূপান্তর
 রূপান্তরিত
- শ**
 শবণাক্ত
 লড়াই
 লাভুক
 সেখালোথি
 লোকশিল্প
 লোকালয়
 লিপি
- শ**
 শাসনকর্তা
 শিক্ষাসফর
 শুধাবেন
 শুষছে
 শোলক
- স**
 সখ্য
 সংগ্রহ
 সবরি কলা
 সমাজ
 সতর্ক
 সমতলভূমি
 সরপুরিয়া
 সহস্র শহিদের
- গা দিয়ে পিষে না যাওয়ার নির্দেশ।
 - মিটিয়ে দিক, পূর্ণ করুক।
 - মুষ্টি।
 - মুগ্ধুর
 - খুব বড় বড় ফোটায় যখন বৃক্ষ পড়ে।
 - স্বাধীনতা, খোলামেলা অবস্থা।
 - বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের বাহিনী।
 - এ দেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সঞ্চাম করেছেন।
 - আত্মহারা, বিভেত।
 - যুদ্ধে ব্যবহৃত কদুকের মতো অস্ত্র।
 - মানচিত্র।
 - বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এ দেশের মানুষকে মরণ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বারবার সহ্য করতে হয়েছে দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার আর নিপীড়ন। তাই মৃত্যু যেন বারবার এসেছে।
 - কষ্ট।
 - যুদ্ধ করেন যিনি
 - যুদ্ধের স্থান।
 - বিশেষ ধরনের গাঢ়ি।
 - রথ চড়ে যুদ্ধ করেন যিনি, বীরপুরুষ যোদ্ধা।
 - রক্তে যা পিছল হয়েছে। (রক্ত যদিও পানির মতো তরল পদার্থ তবু পানির মতো নয়। রক্তের গুরুত্ব আছে, পরিষ্কার ভালো পানির কোনো গুরুত্ব নেই। রক্ত চটচটে আঠার মতো, কিন্তু পানি তেমন নয়। রক্ত আঠার মতো বলেই তা পিছল।)
 - রঙিন।
 - রাজার শাসন যেখানে চালু আছে।
 - খুবই মিষ্টি এক ধরনের খাবার।
 - খুব জোরেসোরে খটাখট শব্দ। (রামশব্দে আমরা বড় আকারের কিছু বোঝাই। যেমন— রামছাগল, রাম বোকা, হাঁদারাম)
 - রাম্প্র, যে দেশে পৃথক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে।
 - পরিবর্তন।
 - এক রকম থেকে অন্য রকম করে ফেলা।
 - লবণ মেশানো। নোম্তা স্বাদের।
 - যুদ্ধ, সঞ্চাম।
 - লজ্জা করে যে।
 - সেখা, রচনা।
 - গ্রামের সাধারণ মানুষের তৈরি শিল্প।
 - যেখানে লোকজনের বসবাস আছে।
 - লিখবার কায়দা।
 - প্রধান শাসক।
 - শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে যে সফর করা হয়।
 - জিজ্ঞাসা করবেন, জানতে চাইবেন।
 - তরল পদার্থ টেনে নেওয়া।
 - শ্রোক, ছোট পদ, ছড়া।
 - বন্ধুতা, ভাব।
 - আহরণ, একত্রীকরণ, সংগ্রহ।
 - এক রকম কলার নাম।
 - আমাদের চারপাশের পরিবেশ, মানুষ।
 - সাবধান, ঝঁশিয়ার।
 - তল সমান যে ভূমির।
 - দুধের সর দিয়ে তৈরি এক রকম মিষ্টি।
 - মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেইসব হাজার শহিদ।

সবিশেষ মুজিবের

সবুজ সোনালি ফিরোজা রূপালি

অরণ

সমৃদ্ধ

সহ্য করা

সন্ধি

স্তৰ্থ

সমন্বয়

সাজা

সাধ

স্থাপত্য

স্নানঘাট

স্নানভাবে

সাক্ষর

সালাত

স্বাধীনতা

শীয়

সুপ্রাচীন

স্তুপ

সুবক্তা

সুধা

সূক্ষ্ম

সেনাপতি

স্নেহ

স্মৃতি

স্নোতা

সোহাগ

সোনার বাংলাদেশ

সংমিশ্রণ

ৰ

মড়োখতু

হ

হতাশ

হাটুরে

হামলে পড়া

হিঞ্চ

হেরিলে

হেল্ডল

- এ দেশ আমাদের সকলের। এ দেশের স্বাধীনতা সঞ্চারে নেতৃত্ব দেন বঙ্গাবস্থু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই এ দেশ সবিশেষ অর্ধাং বিশেষভাবে বঙ্গাবস্থু মুজিবের।
- বাংলার প্রকৃতি বিচিত্র ও সুন্দর। প্রকৃতির নানা রঙে যেন সাজানো এ দেশ। সবুজ শস্যে ভরা আমাদের এ মাঠ। পাটের সোনালি আশ আমাদের সম্পদ।
- মনে করা।
- উন্নত।
- সওয়া, মেনে নেওয়া।
- মিলন, কৌশল।
- নিষ্পন্দ, নিশ্চল।
- সামঞ্জস্য, মিলন।
- শেষ, সমাপ্ত।
- ইচ্ছা।
- স্থাপনা কেন্দ্রিক শিল্পকর্ম।
- গোসল করার জায়গা।
- স্নানের অভাবে, গোসল না করতে পারায়।
- অক্ষরজ্ঞান, বর্ণ চেনে এমন।
- নামাজ।
- মুস্তক, নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারা।
- নিজ, আপন।
- পুরাতন (পুরনো), বহুকাল আগের।
- ঢিবি, ঢিবির মতো বৌদ্ধদের সমাধি।
- ভালোবাজা, যিনি শুছিয়ে বলতে পারেন।
- অমৃত, মধু।
- নিপুণ, সুন্দর।
- সেনাদলের প্রধান, প্রধান সৈনিক।
- ভালোবাসা, প্রেম।
- মনে রাখা।
- বহমান জলের মৃদু ধার।
- আদর।
- প্রিয় মাতৃভূমি। বাংলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। এ দেশকে নিয়ে আমরা গৌরব করি। এ দেশ প্রচুর সম্পদে ভরা। তাই এই বাংলাদেশকে বলে সোনার বাংলা।
- একত্রীকরণ, মেশানো।

- ছয়টি খতু।

- আশাহীন, নিরাশ।
- জিনিসপত্র বোকেনার জন্য যে হাটে যায়।
- হামলা মানে আক্রমণ। আর ‘হামলে পড়া’ বললে আক্রমণ করার মতো বোঝায়।
- প্রাণ হারক, হিংসাযুক্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট।
- দেখিলে।
- যে বৌঢ়কার ভিতরে বালিশ বিছানা ভরে বেঁধে রাখা হয়।

সমাপ্ত

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪র্থ- বাংলা

পরনিন্দা ভালো নয়

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য